উৎস মানুষ

৩৬ বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		২
বাঙালি মননে বিজ্ঞান চেতনা	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	৩
জ্যোতিষশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা ভাষান্তর : আশীষ লাহিড়ী	নরেন্দ্র দাভোলকর	৭
বিস্কুট বনাম ইউরিয়া-মুড়ি	গৌতম মিস্ত্রি	১৫
অসুস্থ সন্তান	ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	২০
শিক্ষার অধিকারের গুঁতো	সুদেষ্ণা ঘোষ	২১
গ্রাম্য চিকিৎসকের আত্মকথন সাধন বিশ্বাস		২৪
পুস্তক পর্যালোচনা	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	২৮
পুস্তক পর্যালোচনা	ধ্রুবা দাশগুপ্ত	২৯
কেন পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন দানা বাঁধছে না?	বিবর্তন ভট্টাচার্য	৩১

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/
৯৮৩১৮৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

পরিবেশ

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

চাঁদের আকাশে একটি গ্রহের ছবি।
'চিনেছ পৃথিবী?' বলেছিলে, মনে পড়ে?
কী সুন্দর, আমরা এ গ্রহে থাকি?
ভালোবাসা-ফুল ফুটেছিল অন্তরে।

মনটা আমার একটুও ভালো নেই
বলো তো আমাকে এ কথা কি সত্যি?
একদিন এই পৃথিবীরই সেরা জীব
ধ্বংস করবে সুন্দর পৃথিবী?

সবই তো দূষিত, মাটি জল হাওয়া আকাশ।
খাদ্যে পানীয়ে, শ্বাসপ্রশ্বাসে বিষ—
মানুষ ছুটছে শুধুই লাভের লোভে
জানে পরিণাম, তবু থামছে না, ইস্!

অন্য জীবেরা আগেও হয়েছে লুপ্ত;
ভয়ানক কোনো প্রকৃতি-দুর্বিপাকে।
এখন কারণ মানুষেরই লোভ শুধু
ভাবলে এ কথা মাথাটা কি ঠিক থাকে?

বিকাশ, বিকাশ, এখানে ওখানে শুনি।
বিকাশ হবে কি প্রকৃতি বিনাশ করে?
ধনিক বণিক বলে, বিকল্প নেই
প্রকৃতির কথা ভেবে দেখা যাবে পরে।

দীক্ষা নিয়েছি মুক্ত বাজার ব্রতে
বেশ তো, হোক না সভা ও সম্মেলন।
প্রকৃতিকে নিয়ে আমরা যে চিন্তিত—
সে কথা বুঝুক সাধারণ জনগণ।

'এই পৃথিবীকে লুণ্ঠন থেকে বাঁচাও,'
লক্ষ কণ্ঠে ওঠে সাবধানবাণী।
পথে নামে যত প্রকৃতিলালিত মানুষ,
প্রকৃতিপ্রেমিক, মানবিক বিজ্ঞানী।

'মন ভালো নেই', বলে তো হয় না কিছু।
যে বাঁচায়, তাকে বাঁচানো আমারও দায়।
'বাঁচাও পৃথিবী' জনকণ্ঠের ধ্বনি—
আমার কণ্ঠ তার সাথে মিশে যায়।

আমাদের কথা

সব ধর্মই সমান, কেউ বেশি সমান

বিশ্ব জুড়েই শুরু হয়েছে হত্যালীলা। নির্বিচারে মারা হচ্ছে নিরীহ সাধারণ মানুষকে। সন্ত্রাসের নাম আইএস। এসব হলেই যেমন হয়, প্রতুল মুখোপাধ্যায়-এর ভাষায়– 'নেতারা সব ভাষণ দিচ্ছেন ময়দানে, মিনারে/ বুদ্ধিজীবী ব্যস্ত এখন ওয়ার্কশপ, সেমিনারে।' কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে দাঙ্গা বা নিধনচক্রীরা এখন শিক্ষিত, তরুণ ছেলেমেয়েদের মগজধোলাই করছে। দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষেরা অত সহজে হানাহানির মধ্যে যেতে চান না। যদি না একান্তই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। দিশাহীন, আদর্শহীন, কর্মহীন, কর্ম থাকলেও স্থায়িত্বহীন ছেলেমেয়েদের মাথা খাওয়াটা তাই সহজতর হচ্ছে।

ধর্ম মানুষের এক আজব আবিষ্কার। এ দিয়ে খুব সহজেই বহু সংখ্যক মানুষকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন চালাতে পারে। মজা করে বলা হয়- সব মানুষই সমান, কেউ কেউ বেশি সমান। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা মুখে বলি– সব ধর্মই সমান। মনে মনে জানি– আমারটা বেশি সমান। একথা প্রমাণ করতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে উজিয়ে গিয়ে গলা ফাটাতে হয়। ইসলামপন্থীরা বলেন, ইসলাম মানে নাকি শান্তি (আসল অর্থ, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আনুগত্য প্রকাশ করা)। খ্রিষ্টানরা শান্তির কথা বলে। হিন্দুরাও তাই। কে বলে না! অথচ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা অক্লেশে নিরীহ মানুষ, মুক্তচিন্তার মানুষকে জবাই করতে পারে। অনীতা দেওয়ান, অবনী নাইয়ারদের নৃশংসভাবে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়। এমন তো কতই হয়। হিন্দুরাও পারে গ্রাহাম স্টেইন নামক নিরীহ পাদ্রিকে পুত্রসমেত গির্জায় পুড়িয়ে মারতে। খুন করতে পারে নরেন্দ্র দাভোলকারদের মতো যুক্তিবাদীদের। যে শঙ্করাচার্যে প্রবল মুগ্ধ স্বামী বিবেকানন্দ, বৌদ্ধ ঠেঙানোয় তাঁরও জুড়ি ছিল না। আর খ্রিষ্টানরা তো হাসতে হাসতে বোমা মেরে জাতি বা দেশকেও শেষ করে দিতে পটু। তার মানে সব ধর্মেই এমন উপাদান আছে, যা দিয়ে অনায়াসে মানুষকে খুনি বানিয়ে ফেলা যায়। পণ্ডিতরা বলবেন, ওরা মৌলবাদী। বিজ্ঞানকে যেমন আমরা ধ্বংসের কাজে লাগাই, ওরাও ধর্মকে খারাপ কাজে লাগাচ্ছে। আসলে জিনিসটা ভাল। মার্কস ধর্মকে অফিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'শোষিত জনসাধারণ এই আফিমের মোহে আচ্ছন্ন থাকে ও যা ন্যায্য অধিকার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তারা সমাজ-জীবনে বঞ্চিত হয়, তা পরজীবনে লাভ করার আশা করে।' মার্কসের মতে, 'বিলিফ ইন গড ইজ দ্য কি-স্টোন অভ আ পারভার্টেড সিভিলাইজেশন।' লেনিনও মনে করতেন, ধর্ম ধনী ও দরিদ্রকে সমদৃষ্টিতে দেখে না। আমাদের দেশে মার্কসবাদীরা অনেকদিন ধরে রাজপাট চালিয়েছেন। তাঁদের বিরাট, শক্তিশালী তরুণ ব্রিগেড ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউ কখনও বলেননি, বুঝলাম ধর্ম শান্তির কথা বলে। কিন্তু তবুও ধর্ম মাথায় থাক। আমরা কোনো ধর্মই চাই না। মানবতাই আমাদের ধর্ম হোক। তা তাঁরা বলেননি। সাধারণ মানুষকে বোঝাননি। নিজের মনে ইষ্টনাম জপো। কিন্তু বাইরে আমার ধর্ম সেরা বলে বেরিয়ে এসো না। মার্কসবাদীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথেও পা বাড়ান নি। কারণ আমাদের দিশি মার্কসবাদী এবং তথাকথিত সেকুলারদের মতো ভণ্ড কমই আছে। উল্টে তাঁরা জলের মধ্যে মাছের তত্ত্ব আওড়ে সার্বজনীন পুজোমোচ্ছবে সামিল হয়েছেন। রাস্তা জুড়ে পুজোর রমরমা বেড়েছে। বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালিয়ের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েছে। এখন তারা কচুয়ায়ও যাচ্ছে। ইদের সময়ে মাথায় রুমা ল বেঁধে ইফতার পার্টি নামক ভোজসভায় ভিড়ে যাচ্ছেন। এই যদি বামপন্থীদের দশা হয়, তাহলে ডানপন্থীরা যে এককাঠি বাড়া হবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ পালাবার পথ নেই, যম আছে পিছে।

সম্প্রতি অভিনব একটি খবর হল বোতলবন্ধী খাঁটি গঙ্গাজল। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্রি হচ্ছে। এমনকি জিপিও থেকেও। আমাদের নদীমাতৃক দেশ। আমরা নদীর গুরুত্ব বুঝতাম। 'পতিতদ্ধারিণী গঙ্গে' বলে গানও বেঁধেছি। পরে ঝাঁ-চকচকে চওড়া রাস্তা আর আকাশচুম্বীর বাড়ি সমার্থক হয়ে ওঠায় গুরুত্ব হারিয়েছে গঙ্গা, মানে নদীগুলো। কলকারখানা এবং শহরবাসীর যাবতীয় বর্জ্য বহনই তার একমাত্র কাজ। গঙ্গাপুজোর ছুতোয় যদি নদীর গুরুত্ব বুঝি, দূষণ কমাই,আখেরে লাভ হতে পারে। কিন্তু বোতলে গঙ্গাজল বিক্রি নেহাত ধাষ্টামো। এরপর অচিরেই প্যাকেটে জগন্নাথের পায়ের ফুল, তিরুপতির গলার মালা, মা কালীর বেলপাতা, ইদগার মাটি বিক্রিও শুরু হয়ে যাবে। সত্যিই 'কী বিচিত্র এই দেশ'!

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

বাঙালী মননে বিজ্ঞান চেতনা

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

গত সংখ্যার পর

বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে ধর্মবোধের একটা সঙ্ঘাতের কথা তো বলেছি আগেই। বাঙালি হোক, অবাঙালি হোক, প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য সর্বত্রই এই সঙ্ঘাত হয়েছে। মানুষের মনে ধর্মবোধ কেন জাগে, এ নিয়ে আইনস্টাইন Science and Religion প্রবন্ধে তিনটি কারণ দেখিয়েছিলেন। প্রথমটি হল ভয়। প্রাকৃতিক কারণগুলো সেই ভয়ের উৎস। বজ্রপাত, বন্যা, আগ্নেয়গিরি, ঝড়, ভূমিকম্প এসব। রোগ, মহামারীও একটা ভয়। এসবের নিয়ন্ত্রক অদৃশ্য শক্তির নাম দেওয়া হল ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বরকে তুষ্ট রাখার কর্মকাণ্ড হল ধর্ম।

মানুষ যত এগিয়েছে, প্রকৃতিকে জেনেছে, ততই এইসব প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ জেনেছে এবং কাজেও লাগিয়েছে। বজ্রপাত বন্ধ করা যায় নি, কিন্তু বজ্ররক্ষী শলাকা দিয়ে বজ্রপাত মুক্ত করা গেছে। রোগব্যাধির প্রতিষেধক জানা গিয়েছে। রোগ হলে আমরা এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি না শুধু, ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে যাই। সঙ্গে হয়ত প্রার্থনাও করি। এখনকার সমাজে ভয় বা অনিশ্চয়তা শুধু প্রাকৃতিক কারণেই হয় না। কারণ, কখন যুদ্ধ লাগবে, কখন চাকরি চলে যাবে এসব ভয় আছে। চাকরির দেবতা ছিল না, ব্যবসারও দেবতা ছিল না, পরে উত্তর ভারতে গণেশকে ব্যবসার দেবতা বানানো হয়েছে। ট্রেন, বিমান এসব ছিল না আগে, ফলে দুর্ঘটনার ভয় ছিল না। ট্রেনেরও কোনও দেবতা নেই। কিন্তু যে কোনও পাহাড়ি রাস্তার শুরুতে দেখা যায় ঠিক একটা মন্দির গজিয়েছে। পাহাড়ি রাস্তায় একটু অনিশ্চয়তা থাকে। দমদম বিমানবন্দরের কাছে এক নম্বর গেটে একটা পীরের দরগা আছে। ওখানে প্রচুর পয়সা পড়ে।

আইনস্টাইন ধর্মভাব জাগ্রত হওয়ার যে দ্বিতীয় কারণটির কথা বলেছিলেন, সেটা হল, সমাজে ন্যায়নীতির একটা মানদণ্ড তৈরি করা। কিন্তু ন্যায়নীতি যেটা তৈরি হয়, সেটা সবসময় যুক্তিনিষ্ঠ হয় না। মেয়েদের পর্দার আড়ালে থাকতে বলা হয়েছে, কিম্বা পুরুষদের একতরফাভাবে তালাকের অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এই নীতি লঙ্ঘন করবে, তাদের শাস্তির বিধানও ধর্ম করেছে। শাস্তি দু রকমের হতে পারে। ঐহিক এবং পরত্রিক। ইসলামে, জেনা বা অবৈধ যৌনতার ঐহিক শাস্তি পাথর ছুঁড়ে মারা। যদি অপরাধী ধরা না পড়ে, ওরা পরত্রিক বা পরকালে শাস্তি পাবে। চুরি করা অন্যায়। এটা ন্যায়নীতি। অনেক ধর্ম, যথা খ্রিষ্টধর্ম ঐহিক দণ্ড দেয় না কিন্তু পরকালে শাস্তির ব্যবস্থা করে। সামাজিক ন্যায় বা মূল্যবোধ তৈরিতে ধর্মের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান সেখানে কিছু সংযোজন করে। বৃক্ষনিধন নিয়ে হিন্দুধর্মে একটা আবছা নিন্দা আছে, কিন্তু বিজ্ঞান চেতনায় আইন তৈরি হয়, দণ্ড হয়। প্লাস্টিকের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ

তেমনই একটা বিজ্ঞানসম্মত নীতি।

তৃতীয় কারণ হল, ধর্ম প্রকৃতির অনেক কারণ ব্যাখ্যা করে। নানা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে ধর্ম। যেমন, কেন ভূমিকম্প হয়, তার কারণ বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্নভাবে দিয়েছে। মানুষ কীভাবে তৈরি হল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কীভাবে তৈরি হল, এরকম আরও কত। ধরা যাক, হিন্দুপুরাণে বলা আছে, বাসুকির মাথায় পৃথিবী রয়েছে। বাসুকি সর্পফণা পরিবর্তন করলে পৃথিবী কাঁপে। এটা একটা ব্যাখ্যা। কিন্তু যুক্তি নেই। সাপটা তাহলে কোথায় আছে, প্রশ্ন করলে আর জবাব পাওয়া যাবে না। এই প্রশ্ন করাটাকে ধর্মদ্রোহ ভাবা হত। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে পারে যুক্তিনিষ্ঠভাবে। কিন্তু সত্যি, সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে নি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী কেন সূর্যের চারদিকে ঘোরে এর একটা নিউটনীয় ব্যাখ্যা আছে, আগে এটাকে বলা হত সূর্যই ঘোরে এবং কেন ঘোরে তা নিয়ে গল্পকথা তৈরি হত, এবং সেটাকেই ধর্ম বলে ভাবা হত।

ধর্মের অনেকটাই শেষ অব্দি গল্প। আমরা মূলত গল্প পূজাই করি। বাঙালিরা। মনসা, বেহুলা, সত্যনারায়ণ পুজো মানে গল্পপুজো। এইসব পুজোর অঙ্গ হল ব্রতকথা। বাঙালি মননে পশ্চিমী যৌক্তিক চিন্তা বেশি ঢোকে নি বলে সেই গল্পগুলোকে যুক্তির নিক্তিতে মেপে নিচ্ছি না। বাইবেলের গল্পগুলি নিয়েই তো গির্জার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের সঙ্ঘাত হয়েছিল। এবং সেই সঙ্ঘাত বহুদিন বহাল রইল। এখন গির্জা হেরে গেছে। জোর গলায় বলতে পারে না বাইবেলের গল্পগুলো সত্যি। বলতে পারে না, আদমের বুকের পাঁজরা দিয়েই ইভকে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এক সময় এই গল্পগাছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কত মনীষীর কত রকমের হেনস্থা। এসব ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল ডারউইনকে নিয়ে। ১৮৫৮ সালে যখন Origin of the Species প্রকাশিত হল, সেটা ঈশ্বরের সাতদিনে বিশ্বসৃষ্টির বিপক্ষে। গির্জা তো ডারউইনকে ব্রুনোর মতো আগুনে পুড়িয়ে মারতে পারে না, কারণ ততদিনে শিল্পবিপ্লব হয়ে গেছে, রেনেসাঁ হয়ে গেছে। গির্জা এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু বিরোধিতায় ততটা জোর ছিল না। গির্জা ততদিনে গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ নিজের থুথু চাটার মতো করে গ্রহণ করে ফেলেছে। কিন্তু মানুষকে পশুর জ্ঞাত্মীয় মেনে নেওয়া যায় না। মানুষ হল ঈশ্বরের স্পেশ্যাল সৃষ্টি। একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলতে থাকল। টিন্ডাল, হারসনি, স্পেন্সাররা একটা সমন্বয় ঘটাতে চাইলেন। শেষ অব্দি বলা যায় সংস্কৃতির দ্বিখণ্ডন হয়ে গেল। দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য এসব নিয়ে হিউম্যানিটিজ। অন্যভাগে বিজ্ঞান। সাহিত্যিকরা সবাই হিউম্যানিটিজের দলে। দর্শন সাহিত্যের তুলনায় হিউম্যানিটিজ তো নাবালক। টমাস আর্নল্ড ছিলেন ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ। ১৮১৮-২০ নাগাদ স্কুল-কলেজের যে সিলেবাস করেছিলেন, তাতে হিউম্যানিটিজের প্রাধান্য ছিল। ভারতে সেই মডেলটাই চাপল। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন দর্শনের পরিবর্তে ব্যবহারিক বিদ্যা শেখানো হোক। সেটা কার্যকর করতে আরও ১০০ বছর লাগল।

ভারতে যখন পশ্চিমী শিক্ষা প্রসারিত হতে লাগল, হিউম্যানিটিজ পড়ার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। উচ্চবিত্তরা ভাবতেন, ওঁদের ছেলে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবে কিম্বা আইসিএস। ইংরিজি ভাষা এবং দর্শন পড়াও গৌরবের ছিল। সত্যেন বসুর বাবা ভেবেছিলেন, ছেলেকে ব্যারিস্টারি পড়াবেন। কিন্তু সত্যেন বসুর জেদের কারণে সেটা হয় নি। মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান না পড়ে কোনও উপায় ছিল না। কারণ উনি যাঁর কাছে মানুষ হয়েছিলেন তিনি ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। ভারতে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা সামাজিকভাবে গৌরবের হয়ে উঠল স্বাধীনতার পর, যখন শিল্প হচ্ছে, সেচ হচ্ছে, বাঁধ হচ্ছে। অঙ্ক শাস্ত্রটাকে অগৌরবের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ওটা হিউম্যানিটিজ গ্রুপেই রাখা হয়েছিল। বিএ-তে অঙ্ক ছিল।

আমাদের দেশেও বিজ্ঞানচিন্তা একটু একটু করে এগিয়েছে। মিশ্র জাতি বাঙালির নানা সংস্কৃতির মিশ্রণ বৈজ্ঞানিক সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে চায় নি। বিদ্যাসাগর বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে কম নিন্দামন্দ সহ্য করতে হয় নি। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নানা ছড়া ও কুৎসা বাজারে ছিল। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কোনও এক পণ্ডিত একটা ১৪ লাইনের কবিতা লিখেছিলেন, যা সাধারণভাবে বিদ্যাসাগর প্রশস্তি মনে হবে, কিন্তু উপর থেকে নিচ বরাবর পড়লে জঘন্য গালিগালাজ। ওঁকে নিয়ে লেখা গান—

জাতি গেল হিন্দু নারীর কিছু না রইল আর
রাঁঢ়ের বে দেবে নিমকি খাবে মেদনাপুরের কুলাঙ্গার।

অক্ষয়চন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব মনের সম্বন্ধ বিচার। ওখানে কোথাও নিরামিষ খাবারের প্রশংসা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন–

ছিঁড়ে ফেল বাহ্যবস্তু টেনে ফেল কুম
পেট পুরে মাছ খেয়ে কষে দাও ঘুম।

কুম হল নিরামিষ আহারের সুফল প্রচারকারী এক সাহেবের সংক্ষিপ্ত নাম।

রামমোহনকে নিয়ে গান বাঁধা হয়েছিল–

সরাই মেলের কুল বেটার বাড়ি খানাকুল
ওং তৎসৎ বলে ব্যাটা বানিয়েছে ইস্কুল
ব্যাটা সর্বনাশের মূল।

বিদ্যাসাগর তখন মেট্রোপলিটানে। গুড সাহেব শিক্ষা-অধিকর্তা। একটা ছড়া তৈরি হল–

গুড সাহেবের লম্বা ঠ্যাং
তার নিচে ঈশ্বর ব্যাঙ
তার নিচে গুপে কানা, বড়দানা
ফেরেস্তানি ষোল আনা।

গুপে কানা মানে শিক্ষক গোপেন্দ্র গোস্বামী। চোখে চশমা ছিল, তাই গুপে কানা, বড়দানা। এর কম নিম্ন রুচির মন্তব্য সহ্য করতে হয়েছে। দিন এগিয়েছে। বিজ্ঞান আন্দোলন যারা করে, তাদেরও নিত্যনতুন বাধার সামনে আসতে হয়েছে। কিন্তু তার প্রকৃতি অন্য। অশোককে হয়ত এ ধরনের ছড়া শুনতে হয় নি–

উৎস মানুষ দেব ঠুসে
কী হবে আর এসব পুষে
অশোক বাড়ুয্যে ঘরে থাকুক বুড়ো আঙুল চুষে।

এইসব বাধাবিপত্তির মধ্যেও বাংলায় বিজ্ঞান রহস্য, বিজ্ঞান কৌমুদী ইত্যাদি পত্রিকা বেরিয়েছে। প্রবাসী, মর্মবাণী, ভারতী, বসুমতী থেকে আজকের দেশ পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ছাপা হচ্ছে।

১৮৬৫-৬৫ সাল নাগাদ কালীধর বেদান্তবাগীশ লিখছেন–

সর্পমুণ্ডে আছে ধরা আমাদের এই বসুন্ধরা
পুরাণে যদিও আছে মন নাহি মানিছে
সূর্য আছে মধ্যাকাশে বুধ গ্রহ তারই পাশে
শুক্র অতঃপরে ভ্রমিছে
বৃহস্পতি শনৈশ্চর, তাঁরাও আকাশচর
শনির দৃষ্টিতে গণেশ মুণ্ড হারাইল
কিন্তু যারা দূরবীনে শনিগ্রহ নেয় চিনে
শনির দৃষ্টিতে তাঁদের কিছু না হইল।

এই কালীধর বেদান্তবাগীশ নাস্তিক ছিলেন না। ঈশ্বর মানতেন। গলায় পৈতেও ছিল। কিন্তু গল্পের কাছে সমর্পণ করেন নি। যুক্তি দিয়ে বিচার করেছেন। কালীধরের মতো অনেকেই ছিলেন। কিন্তু দলে ভারী তাঁরাই, যাঁরা বলতেন,

'পুরাণ মানে না যারা ঋষিবাক্যে করে হেলা
গোলদীঘিতে অন্ন ধ্বংসে বাপের শ্রাদ্ধে করে হেলা
সব ব্যাটাকে ঘরে এনে গোবর খাওয়াও এই বেলা।'

এইসব নিয়েই বাঙালির বিজ্ঞানচেতনা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। গড়পড়তা মালয়ালি বা মণিপুরিদের থেকে অনেক পিছিয়ে। ব্রিটিশ সংস্পর্শে আগে এসেও বিজ্ঞান চেতনায় সেভাবে এগোয় নি, কারণ বাঙালি সব কিছুর মিশ্রণ ঘটিয়েছে। ধরা যাক সেই বেদমন্ত্র। বেশির ভাগটাই স্তুতি। তোষামোদ। বরুণ, অগ্নি, ঊষা, মরুৎ, সূর্য সবাইকে। তারপর দাও দাও দাও প্রার্থনা। ঘি ঢালা। এরপর আদিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া বলিদান। ঘোড়া, গরু, ভেড়া উৎসর্গ। দাও, বদলে নাও। ঘুষ কালচার এই সমাজে আসবে না কেন? যাগযজ্ঞের পর মূর্তিপূজা, সঙ্গে তান্ত্রিক ক্রিয়া। বাঙালির পূজাপদ্ধতিতে সব কিছুই মিশে আছে। ভূততাড়ানো, জলশুদ্ধি করা, দেবতার স্তুতিমূলক ধ্যান, তান্ত্রিক মতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ভোজ্যদান, তারপর এটা দাও,ওটা দাও প্রার্থনা।

বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের Ritual ও adjustmentটা লক্ষ্য করে অবাক হয়েছি। মনে করুন, দেবতাকে মিষ্টান্ন নিবেদন। দুধকে ছিন্ন করা বা ছানা করা অধর্ম ছিল। দুধকে ঘন করে ক্ষীর বা প্যাড়া করা যেত। তাই মন্দিরে প্যাড়া প্রসাদ হয়। বাঙালি পর্তুগীজদের প্ররোচনায় ছানা করা শিখল, এবং আপন প্রতিভায় ছানার মিষ্টি বানানো শিখে গেল। কিন্তু দেবতাকে উৎসর্গ করা চলত না। এখন চলে। পুজোয় বাক্সো বাক্সো সন্দেশ, কিন্তু রসগোল্লা চলে না। লেডিকিনি তো আরও নয়। কিন্তু বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে দেখি বুদ্ধদেবের মূর্তির সামনে নানারকম চিপ্‌সের প্যাকেট, বাদাম, নানারকম নরম পানীয়র বোতল রাখা আছে দেখেছি। যে যা ভালবাসে বুদ্ধদেবকে খেতে দিয়েছে।

পুজোয় ব্যবহার করা হয় পাত্রগুলোর দিকে খেয়াল করেছেন? শুদ্ধ পাত্র বলতে শাস্ত্রমতে, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাষ্ঠ, প্রস্তর, তাম্র। অশুদ্ধ হল লৌহ, কাংস। মৃত্তিকা পাত্র শুদ্ধ,

তবে একবারই ব্যবহার করা যায়।

তার মানে কাচের পাত্র, চিনেমাটির পাত্র পুজোয় নিষেধ। আগে চলত না, কিন্তু এখন চলছে। লৌহপাত্র অশুদ্ধ, তাহলে স্টিলের পাত্রও অশুদ্ধ। কিন্তু স্টিলের পাত্র দিব্য চলছে। হিন্দু গেরস্ত বাড়ির ঠাকুরের আসনে স্টিলের ছোট রেকাবিতেই তো নকুলদানা দেওয়া হয়, স্টিলের ছোট গেলাসে জল। কিন্তু প্লাস্টিক চলছে না এখনও। কিন্তু ঠিক ঢুকে যাবে। হিন্দু গেরস্ত বাড়িতে এঁটোকাঁটার একটা ব্যাপার আছে। মেঝেতে বসে খাওয়ার পর গোবর লেপে জায়গাটা শুদ্ধ করা হত। বাঁ হাতে জল খাওয়া চলত না। কারণ এতে বাঁ হাতটাও এঁটো হয়ে যাবে। জামায় ভাত পড়লে জামাটা ধুয়ে ফেলতে হত। মুশকিল হল যখন বাড়িতে ডাইনিং টেবিল ঢুকল। টেবিলে ভাতটাত খাওয়া হলে কি পুরো টেবিলটাই এঁটো হয়ে যায়? গোঁড়া ধর্মাচারীরা টেবিলে খেতেন না। আমি দেখেছি নিমন্ত্রণ বাড়িতে পুরোহিত এবং পণ্ডিতদের পিঁড়ি পেতে আলাদা খাবার ব্যবস্থা করতে হত। যাই হোক, পুরো টেবিল না ধুয়ে খালি উপরটা মুছে নেওয়া হত। আরও মুশিকিল হল ফ্রিজ ঢোকার পর। ফ্রিজে ভাত-তরকারি রাখলে পুরোটাই তো এঁটো হয়ে যায়। কী করা যাবে? বামুন ঘর, গোঁড়া ঘর, যাঁরা এখনও পঞ্জিকা মেনে, শুভদিন দেখে পুরী বেড়াতে যাবার টিকিট কেনেন, গোত্র গণ মিলিয়ে কোষ্ঠী বিচার করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন। তাঁদের ঘরেও ফ্রিজ আছে, কিন্তু ফ্রিজের বডিটাকে এঁটো মনে করেন না। গোটা ফ্রিজটা এঁটো হয়ে গেলে তো মহা মুশকিল। আরও ধর্মসঙ্কট উপস্থিত হল বাড়িতে বিধবা হলে। বিধবাদের তথাকথিত শুদ্ধতা এখনও অনেক বাড়িতে জরুরি। অনেকে এখনও মাছ খান না। ওদের জন্য একটা নিরামিষ ফ্রিজ কেনার ক্ষমতা নেই কিম্বা স্থানাভাব। ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফ্রিজের মধ্যেই একটা তাককে ভাবা হল শুদ্ধ তাক। ওই তাক মায়ের তাক। ওখানে শুধু মায়ের জিনিস থাকবে। এভাবেই পুরনো প্রথার সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির আপস চলছে। বাঙালি মননে বিজ্ঞানচেতনা তথা যুক্তিবাদের প্রসার অনেকটাই থমকে গেছে। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের পর আরও দু-তিনজন বিদ্যাসাগরের মাপের মানুষ দরকার ছিল। ঈশ্বরে অবিশ্বাসই বিজ্ঞানচেতনার প্রধান শর্ত নয়, বরং যুক্তিনির্ভরতা, সমাজের হিতাহিতের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখা।

বিজ্ঞান তো মানুষের জন্যই এবং মানুষ একা বাঁচে না। মানুষকে ঠিক মতো বাঁচার পথ দেখায় বিজ্ঞান। প্রকৃতির নিয়ম জেনেই প্রকৃতির শক্তি থেকেই তৈরি করেছে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ থেকে নানারকম যন্ত্র এবং এই সব যন্ত্রের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে চেতনা। প্লাস্টিক মানুষই বানিয়েছে, মানুষকেই এর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এখানেই যুক্তিবুদ্ধি। বাঙালির এখানেই অভাব। শহর নোংরা করা, যেখানে খুশি হকার বসে যাওয়া নিয়ে উদাসীন থাকা, রেল অবরোধ, পথ অবরোধ এসব যুক্তিহীনতা মেনে নিচ্ছি। জলপড়া, গুণপড়া, মাদুলি কবচের মতোই অবরোধ অবৈজ্ঞানিক। গুটকা খাওয়া খারাপ, গুটকা বা পানের পিক যেখানে সেখানে ফেলা কিম্বা তারস্বরে মাইক বাজানো, এগুলো কোনোটাই যুক্তি মানে না। ভোলে বাবা পার করেগা, জয়বাবা লোকনাথ কাতারে কাতারে চলেছে কাঁধে বাঁক নিয়ে। যাচ্ছে যাক, ওদের আনন্দের জন্য সারা পথে মাইক বাজানো এসব দেখে বাঙালির বিজ্ঞানচেতনায় সন্দেহ জাগে। আমাদের শিক্ষার গোড়া থেকে এমন কিছু থাকা দরকার যা যুক্তিকে শাণিত করে। মানুষকে সামাজিক হতে শেখায়।

“ বাঙালি মননে বিজ্ঞানচেতনা তথা যুক্তিবাদের প্রসার অনেকটাই থমকে গেছে। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের পর আরও দু-তিনজন বিদ্যাসাগরের মাপের মানুষ দরকার ছিল। ঈশ্বরে অবিশ্বাসই বিজ্ঞানচেতনার প্রধান শর্ত নয়, বরং যুক্তিনির্ভরতা, সমাজের হিতাহিতের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখা। ”

আহরণ

জ্যোতিষশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা

নরেন্দ্র দাভোলকর
(ভাষান্তর: আশীষ লাহিড়ী)

'সুদূর, বিপুল সুদূর' আকাশে মিটমিট করতে-থাকা তারাগুলো আদিম মানবকে মোহিত করত। তারাগুলো নিয়ম মেনে আকাশে ওঠে, দিনের পর দিন যার যার নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলাফেরা করে, কখনো ভুল করে না। সে তুলনায় এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন কত নিরাপত্তাহীন, কত অনিয়মিত। আকাশের তারাদের আচরণের এই বিরামহীন শৃঙ্খলা মানুষকে মুগ্ধ করে। স্মরণাতীত কাল থেকেই তো সে তারাদের দেখে আসছে। ব্যাবিলোনিয়ার লোকেরা খ্রিস্টপূর্ব ৪২০০ সাল থেকে গ্রহতারকাদের চলাফেরার নোট রাখতে শুরু করে। সেসব পর্যবেক্ষণের মূলে ছিল কৌতূহল। সেই পর্যবেক্ষণ থেকে বহু বিচিত্র সব ঘটনা বেরিয়ে এল। যেমন আকাশে সূর্যের অবস্থান-বদলের সঙ্গে তাল রেখে ঋতুবদল; জোয়ার-ভাটার সঙ্গে চাঁদের পূর্ণিমা-অমাবস্যার সম্পর্ক; সূর্য আর চাঁদের গ্রহণ; আকাশে তারার অবস্থান দেখে দিক নির্ণয়। শত শত বছর ধরে এইভাবে পর্যবেক্ষণ আর নোট নেওয়ার পর এইসব খতিয়ান-রক্ষকেরা কতকগুলো সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারল। সেইসব সিদ্ধান্তর জোরে তারা কবে পূর্ণিমা হবে আর কবে অমাবস্যা; কবে গ্রহণ লাগবে, কবে আকাশে একটা ধূমকেতুর উদয় হবে, কোন সময় ঘটবে ঋতুর পরিবর্তন, তার দিনক্ষণ আগে থেকেই বলে দিতে পারল। সেই প্রাচীন কালের জ্যোতিষশাস্ত্রীরা আকাশে বিশেষ কতকগুলো তারার আবির্ভাব দেখে আগে থেকে বলে দিতে পারত কবে বৃষ্টি হবে, নীলনদ তার তীরে তীরে পলিমাটি ফেলে যাবার পর কখন বীজ বপন শুরু করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারত কৃষকদের। পরে নক্ষত্রমণ্ডল আর ঋতুচক্র সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানকে কৃষির কাজে লাগানো হল; আর নক্ষত্র সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান রাত্রে ভ্রমণকারীদের দিক নির্ণয়ের কাজে লাগল। এখান থেকে উঠে এল এই যুক্তি যে পৃথিবীতে যেসব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে আকাশের সূর্য-চন্দ্র-তারার সম্পর্ক রয়েছে; তা যদি হয় তাহলে মানুষের জীবনের সঙ্গেও নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্ক আছে। প্রথম-প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত আর জ্যোতিষশাস্ত্র সবটা মিলিয়ে একটাই সমন্বিত বিজ্ঞান হিসেবে চর্চা করা হত। কিন্তু পরে মানুষের বিজ্ঞান আর সংস্কৃতি যখন আরো উন্নত হল তখন গণিত একটা স্বতন্ত্র চর্চার বিষয় হিসেবে উঠে এল। ষোড়শ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানও হয়ে উঠল একটা স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের বিষয়। তার পর থেকে বিজ্ঞানের এই দুই অসাধারণ শাখা কিছু জিনিসকে বর্জ্য পদার্থের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর সেই আবর্জনাগুলোই জ্যোতিষশাস্ত্র হিসেবে রয়ে গেল। ততদিনে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু কিছু গণৎকারের কায়েমি স্বার্থ গজিয়ে গেছে। মানুষের দুর্বল মনে তারা কিছু সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাতে সমর্থ হল। মানুষের এই প্রয়োজনই জ্যোতিষশাস্ত্রকে টিকে থাকতে সাহায্য করল।

বলা হয়ে থাকে, 'সাহায্য আর সান্ত্বনার জন্য শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব লোকই তো জ্যোতিষশাস্ত্রের শরণ নেয়, তাহলে জ্যোতিষশাস্ত্র ধাপ্পাবাজি হবে কেন?' এই কথাটা অযৌক্তিক। নানা লোকে নানা কাজ করে। তাতে করে প্রমাণ হয় না যে সেই কাজগুলো ঠিক কিংবা বিজ্ঞানসম্মত। দেশ জুড়ে বহু লোক তামাক খায়, মদ খায়, দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। তাদের আচরণকে তো ঠিক বলে কিংবা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া হয় না। মানুষের আদর্শ আচরণের সঙ্গে তাদের এ আচরণ তো খাপ খায় না! কোনো একটা জিনিস বিজ্ঞানসম্মত কিনা তা বিচার করার সুনির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড আছে। দুনিয়ার সর্বত্র সেই মানদণ্ডগুলো এক। জ্যোতিষশাস্ত্রকে তখনই বিজ্ঞান বলে মেনে নেওয়া যাবে যখন তা ওই সমস্ত মানদণ্ডে পাস করবে। আপাতত জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি লাভের ধারেকাছেও নেই।

আমাদের বলা হয় যে, ভারতে জ্যোতিষশাস্ত্রের ঐতিহ্য বেদের মতোই পুরোনো। অথচ ঋগ্‌বেদ আর যজুর্বেদের 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' অংশে 'ফলজ্যোতিষ'-এর, অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রের সামান্যতম কোনো উল্লেখ নেই। তবে গ্রহ আর নক্ষত্ররা যে মানুষের ভূত ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেয়, এই ধারণার সঙ্গে হিন্দুদের 'কর্মবিপাক তত্ত্ব (এ জন্মের পাপের ফসল পরজন্মে), প্রারব্ধ তত্ত্ব (আগের আগের জন্মের কাজের দ্বারা নির্ধারিত ভাগ্য), বিধিলিখিত (নিয়তি) তত্ত্ব এবং পূর্বসঞ্চিত (আগের আগের জন্মের সুকৃতি ও কুকাজের সঞ্চয়) তত্ত্ব' বেশ খাপ খেয়ে যায়। কাজেই হিন্দুদের মন খুব সহজেই ফলজ্যোতিষ বা জ্যোতিষশাস্ত্রকে মেনে নিতে পেরেছিল। কিন্তু এসব কোনো কিছুই জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করার মতো কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করে না।

জ্যোতিষশাস্ত্র হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে এবং মহা মহা ঋষিরা এ বিষয়ে মোটা মোটা পুঁথি লিখে গেছেন, তাই জ্যোতিষশাস্ত্র নিশ্চয়ই বিজ্ঞান– একথা ভুল। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা হাজার হাজার ভুল ধারণার বশে চলেছি: যেমন পৃথিবীটা নাকি চ্যাপ্টা, সূর্য নাকি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, শেষনাগ মাথা নাড়লে নাকি ভূমিকম্প হয়, রাহু আর কেতু নামে দুই দৈত্য সূর্য আর চাঁদকে গিলে ফেললে নাকি গ্রহণ হয়, পোয়াতি অবস্থায় কুটনো কুটলে নাকি গন্নাকাটা বাচ্চা হয়, যজ্ঞ করলে নাকি বৃষ্টি নামে, সমৃদ্ধি আসে ইত্যাদি ও প্রভৃতির এক লম্বা ফর্দ বানানো চলে। কিন্তু বিজ্ঞান যেমন যেমন এগিয়েছে তেমনই এইসব ভুল ধারণা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে। ভৃগুসংহিতা নামক এক প্রাচীন গ্রন্থকে দৈব জ্যোতিষবিজ্ঞানের সাক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়। বলা হয়, আমাদের সর্বজ্ঞ ঋষিরা ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের সবকিছুই দেখতে পেতেন। যখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের উদয় হয়েছে, তখন থেকে শুরু করে বর্তমানে যত মানুষ আছে এবং দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ জন্মাবে, সক্কলের ভবিষ্যৎ নাকি ওই বইতে তাঁরা লিখে গেছেন। বিশ্বের কোথায় কী ঘটে, ঋষিরা সেটা সহজাত ক্ষমতাবলেই জানতেন, এই কথাটা সত্য নয়। সহজাত স্বজ্ঞার ওপর নির্ভর করে কোনো বিজ্ঞান গড়ে তোলা যায় না; বিজ্ঞানের সৌধ গড়ার একমাত্র পথ হল প্রাকৃতিক ঘটনা আর মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে যুক্তিসিদ্ধ সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে চর্চা করা।

লোকে ভবিষ্যদ্বাণী করবার নানারকম পথ বেছে নিয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটার উল্লেখ করছি।

১) তোতাপাখিকে দিয়ে ভবিষ্যৎ গোনানো, ২) স্ফটিক গোলকের দিকে চেয়ে থাকা, ৩) আলোর শিখার ভুষোর মধ্য দিয়ে তাকানো, ৪) রুদ্রাক্ষর (একরকমের পবিত্র গাছের জামজাতীয় আঁটি) মধ্য দিয়ে তাকানো, ৫) রামল বিদ্যা (রেখাচিত্র, রেখা আর ছক্কার সাহায্যে ভবিষ্যৎগণনা), ৬) সংখ্যার সাহায্যে ভবিষ্যৎগণনা, ৭) হস্তরেখা গণনা (কাইরোম্যান্সি), ৮) হাতদেখা। ৯) কোষ্ঠীবিচার বা জ্যোতিষবিদ্যা, ১০) ভৃগুসংহিতা বা নাড়িগ্রন্থ।

ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার এরকম আরো কয়েকটি পন্থার চল আছে। এদের কোনোটাই কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই কথাটা উচ্চারণ করা মাত্রই জ্যোতিষীরা খেপে ওঠেন। তাঁদের যুক্তি হল: একজন ডাক্তার যখন কোনো রোগনির্ণয় করেন, আমরা সেটা মেনে নিই, কারণ তিনি ওই বিষয়ে প্রণালীবদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত; 'একজন অবিশেষজ্ঞ, যে ডাক্তারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়নি, যে ডাক্তারি বিষয়ে কিছুই জানে না, তার তো ওই রোগনির্ণয় নিয়ে মন্তব্য করবার কোনো অধিকার নেই! ঠিক তেমনি, যারা জ্যোতিষচর্চা করেনি, ফলত অজ্ঞ, তাদেরও জ্যোতিষ নিয়ে কোনো মন্তব্য করার বা তা নিয়ে আপত্তি তোলার কোনো অধিকার নেই।' আপাতদৃষ্টিতে এ যুক্তি অকাট্য হলেও আসলে তা নয়। আসলে এ যুক্তি সুকৌশলে আমাদের ভুল পথ দেখায়। কীভাবে ভুল পথ দেখায় সেটা আমাদের জানা উচিত।

'করনি' আর 'মুখ মারানে' (মন্ত্র পড়ে বা তুকতাক করে ক্ষতি করা), জাদুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, ভানুমতীর খেল– এসব সব জায়গাতেই হামেশা দেখা যায়। এগুলো সবই কুসংস্কার। যেসব কুসংস্কার শোষণমূলক কিংবা প্রাণসংশয় ঘটাতে পারে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় একটি বিল পাস হয়েছে। কেউ বলতে পারবে না যে, যেহেতু এগুলো ব্ল্যাক ম্যাজিকের আওতায় পড়ছে, তাই যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে চর্চা করেনি তাদের এসবের বিরোধিতা করার বা এগুলো বন্ধ করার আইন চালু করার জন্য চাপ দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। ব্ল্যাক ম্যাজিকের নিয়মগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞানের নিয়মগুলোর প্রত্যক্ষ বিরোধ রয়েছে, একের সঙ্গে অপরের কোনো সম্পর্কই নেই। জ্যোতিষের ব্যাপারেও সেই একই কথা। তথাকথিত

জ্যোতিষী বিজ্ঞান, যা দু হাজার বছরের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের দাবিদার, তা কিন্তু এমন কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সর্বজনীন সূত্রের কথা বলেনি, যা বৈজ্ঞানিক যাচাই-পরীক্ষার ধোপে টিকতে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্রের তিন তত্ত্বপ্রস্তাব

কোনোকিছুকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণ করতে গেলে প্রথমেই একটা তত্ত্বপ্রস্তাব (হাইপোথিসিস) গঠন করতে হয়। এটা একেবারে আবশ্যিক। তারপর পর্যবেক্ষণ, বিচারবিশ্লেষণ, কঠোর নিয়মবদ্ধ যুক্তিপ্রয়োগ, গণিত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে সেই তত্ত্বপ্রস্তাবটিকে প্রমাণ করতে হয়। যেসব জ্যোতিষীর মতে জ্যোতিষ একটি বিজ্ঞান, তাঁরা কিন্তু এখনো সেরকম কোনো তত্ত্বপ্রস্তাব হাজিরই করতে পারেন নি। কাজেই তত্ত্বপ্রস্তাবটিকে বাজিয়ে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। তবে বলাই বাহুল্য, ফলিত জ্যোতিষচর্চার গোটা ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে অপ্রমাণিত তত্ত্বপ্রস্তাবের ওপর। জ্যোতিষীরা নিজেরাই মেনে নেন যে জ্যোতিষের সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে ওইরকম এক তত্ত্বপ্রস্তাবের ওপর। সেটিকে এইভাবে সাজিয়ে লেখা যেতে পারে:

- আকাশের গ্রহতারকাগুলি ক্রমাগত মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে।
- সেই প্রভাব নির্ভর করে জাতকের জন্মসময়ের ওপর।
- সেই প্রভাব জাতকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেয়, যে-ভবিষ্যৎ বুদ্ধিগম্য ও কখনো কখনো পরিবর্তনযোগ্য।

এরই ওপর দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতিষের গোটা সৌধটা। একটুখানি অনুসন্ধান করলেই টের পাওয়া যাবে এটা একেবারেই ফাঁপা। কোন কোন গ্রহ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে তা নির্ধারণের ব্যাপারে জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রচুর অস্পষ্টতা আছে। আকাশের হাজার হাজার তারা আর গুটিকতক গ্রহ কোষ্ঠীতে আদপেই স্থান পায় না। বলাই বাহুল্য, তাদের সবগুলোকে কোষ্ঠীতে জায়গা করে দেওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীনকালে। সেই প্রাচীনকালের জ্যোতিষীরা ভাবতেই পারতেন না এই মহাবিশ্বের পরিসর কী বিপুল। আমাদের এই পৃথিবীর নিবাস সৌরজগতে এবং ন্যায্যতই প্রাচীনকালের জ্যোতিষীরা কেবল এই সৌরজগৎটিকেই বিবেচনার মধ্যে আনতেন। বর্তমানের জ্যোতিষীরা ওই যুক্তিতেই হাজার হাজার তারকাকে হিসেবের বাইরে রাখার ব্যাপারটার সপক্ষে সওয়াল করেন। বেশ, ভালো কথা। কিন্তু কেবলমাত্র সৌরজগতের গ্রহগুলোকে হিসেবের মধ্যে আনার ব্যাপারেও প্রচুর যে গণ্ডগোল রয়েছে। এইসব গ্রহর বিশালত্ব সম্বন্ধে এঁদের কোনো ধারণাই নেই। পৃথিবী গ্রহের সঙ্গে এইসব গ্রহের দূরত্ব যে কী বিরাট তা এঁরা জানেনই না।

কোষ্ঠী বানানোর সময় রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু আর কেতু এই কটি 'গ্রহ'কে হিসেবের মধ্যে ধরা হয়। দেড়শো বছর আগে বানানো কোষ্ঠীগুলোতে ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো গ্রহের কোনো উল্লেখ থাকত না। কারণ সেগুলো তখন আবিষ্কৃত হয়নি, তাই জ্যোতিষীরা তাঁদের অস্তিত্বের খবর রাখতেন না। কিন্তু তাঁরা যদি নিজেদের 'জ্যোতিষ নামক বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা' বলেন, তাহলে এগুলোর অস্তিত্বর কথা তো তাঁদের জানা উচিত ছিল। এবার দেখা যাক কোষ্ঠীতে উল্লিখিত তথাকথিত গ্রহগুলোর কী দশা। যে রবিগ্রহের উল্লেখ কোষ্ঠীতে থাকে, সেটা তো আসলে একটা তারকা। আর চন্দ্রও তো গ্রহ নয়, পৃথিবী গ্রহের একটি উপগ্রহ মাত্র। রাহু আর কেতুকে গ্রহ বলে উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু ওগুলোর আদপে কোনো অস্তিত্বই নেই। চাঁদের কক্ষপথ যে দুটি বিন্দুতে পৃথিবীর কক্ষপথকে ছেদ করে, সেই দুটি বিন্দুর নাম রাহু ও কেতু। পুরোনো কালের জ্যোতিষীদের কল্পনায় এই রাহু আর কেতু, দুটি প্রকাণ্ড গলা-পেঁচানো সাপ বা দৈত্যর রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল, যারা সূর্য আর চাঁদকে গিলে ফেলে আর তখন গ্রহণ হয়। (দক্ষিণের জ্যোতিষীরা তাঁদের কোষ্ঠীতে মান্ডি নামে রাহু আর কেতুরই মতন আরো এক গ্রহের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেন; আবার পশ্চিমের জ্যোতিষীরা এইসব কাল্পনিক গ্রহগুলোকে একেবারেই অস্বীকার করেন।) পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ কোষ্ঠীতে স্থান পায়, কিন্তু বৃহস্পতির চার-চারটি উপগ্রহের একটিও পায় না। অথচ এখনো পর্যন্ত বৃহস্পতির তেষট্টিখানা উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অনেকগুলোই আকারে চাঁদের আড়াই গুণ। সব মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে কোষ্ঠীর ন খানা গ্রহের মধ্যে সূর্য আদৌ গ্রহ নয়, তারা; চাঁদ পৃথিবীরই উপগ্রহ আর রাহু-কেতুর কোনো অস্তিত্বই নেই। সুতরাং যে-ন খানা উপাদান নিয়ে কোষ্ঠী তৈরি হয়, তার মধ্যে চারটিই ভুল, যার অর্থ মোট সূত্রগুলির ৪৪ শতাংশই ভুল।

যদি কোনো মারাঠিকে [যে কোনো বাঙালিকেও: বঙ্গানুবাদক] জিজ্ঞেস করা যায়, 'আমাদের সৌরব্যবস্থার মধ্যে কোন গ্রহটি মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর?', তাহলে অবধারিতভাবেই উত্তর আসবে: 'শনি।' শনিগ্রহকে এতই ডরায় সবাই। আসলে কিন্তু সৌরজগতের যে-গ্রহটি সবচেয়ে বিপজ্জনক, মানুষের ওপর যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি, সেটি হল আমাদের এই পৃথিবী। মানুষের গোটা জীবনের যত সুখ, যত দুঃখ, সবই তো এই গ্রহটির সঙ্গে জড়িত, কারণ এই গ্রহেই তো মানুষের সারা জীবন কাটে। অথচ মজা দেখুন, কোষ্ঠীতে এই গ্রহটিরই কোনো ঠাঁই নেই! এই খামতির কারণ হিসেবে জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র। এইভাবে তাঁরা এক কোপে কোপার্নিকাস-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানে যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে সে সবই উড়িয়ে দেন!

কোনো কিছু যে বিজ্ঞানসম্মত তা প্রমাণ করবার উপায় কী? এটা নির্ণয় করবার সরল নিয়মটা হল, সেই জিনিসটার কার্যকারিতাকে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যাচাই করে নিতে পারা উচিত। ধরুন, কতকগুলো ভেষজগুণযুক্ত গুল্ম দিয়ে তৈরি একটা আরক একটা বিশেষ রোগ সারিয়ে দিল। ধরে নেওয়া যাক, মোট দশটা গুল্ম দিয়ে ওই আরকটা তৈরি। স্বভাবতই ওই অসুখ সেরে যাওয়ার পিছনে আছে ওই দশটি উদ্ভিদের সবকটির সম্মিলিত ক্রিয়া। কিন্তু অসুখের কোন লক্ষণটির ওপর ওই দশটি উদ্ভিদের মধ্যে কোনটি ক্রিয়া করে, সেটা তো এ থেকে জানা সম্ভব নয়। সেটা বার করতে হলে আমাদের দশটি উদ্ভিদের প্রত্যেকটিকে নিয়ে একটা করে আলাদা আরক বানিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কোন উদ্ভিদ অসুখের কোন লক্ষণের ওপর ক্রিয়া করে এবং কীভাবে করে। একমাত্র এভাবেই আমরা ওই আরকটির নিখুঁত বিশ্লেষণ করতে পারব। জ্যোতিষও তো বিশ্বাস করে যে সৌর জগতের সবকটি গ্রহ একযোগে অবিরত মানুষের জীবনের ওপর কাজ করে চলেছে। অথচ কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গুনে বলবার সময় জ্যোতিষী তাকে প্রতিটি গ্রহের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলাদা আলাদা করে জানান, যথা মঙ্গলের বা শনির বা বৃহস্পতির ক্রিয়া। প্রতিটি গ্রহের ক্রিয়া সম্বন্ধে জানাটা আমাদের উদাহরণে আরকের প্রতিটি উদ্ভিদের ক্রিয়া আলাদাভাবে জানার সঙ্গে তুলনীয়। আরকের প্রত্যেকটি উদ্ভিদের ক্রিয়া আলাদা আলাদা করে যাচাই করা সম্ভব। কিন্তু কোনো একটা গ্রহর ক্রিয়া পরীক্ষা করবার জন্য ওই পর্বে অন্য সব গ্রহগুলোর ক্রিয়া বন্ধ রাখা তো আর সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিটি গ্রহের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা যা বলা হয় তার আদপেই কোনো স্বাধীন পর্যবেক্ষণভিত্তিক ভিত্তি নেই।

বিজ্ঞানের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের স্তর থেকেই ক্রিয়া করতে শুরু করে। ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ চালালে তা থেকে কিছু খতিয়ান জমা হয়। আর সেই খতিয়ানের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে বিজ্ঞানের সৌধ। জ্যোতিষের মৌলিক খামতিটা এই জায়গাতেই। জ্যোতিষ নিয়ে ওইরকম কোনো মূলগত পর্যবেক্ষণ চালানো সম্ভবই নয়। ধরা যাক একটা কোনো গাছে বছরে একবার কিংবা এক বছর অন্তর অন্তর ফল ধরে। এ ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করে খতিয়ান রাখা সম্ভব। কিন্তু যদি গাছটা একশো বছরে একবার করে ফল দেয়, তাহলে পর্যবেক্ষণ খুবই কঠিন হয়ে পড়বে, যদিও একেবারে অসম্ভব হবে না। কিন্তু যদি বলা হয়, গাছটা এক লক্ষ বছরে একবার ফল দেয়, তাহলে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে ওই বিশেষ গাছটি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। পৃথিবী কিংবা সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহ বা নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? একটানা পর্যবেক্ষণ করতে হলে হুবহু একই দশার বারংবার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। আপাতত ধরে নেওয়া যাক, সৌর জগতের গ্রহগুলো সত্যিই মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। তা যদি হয়, তাহলে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের সবকটি তারাই, এমনকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাকি সবকটি গ্যালাক্সির তারাগুলোও নিশ্চয়ই আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে। এই সমস্ত কিছুকে একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করাটাই হবে সব দিক থেকে নিখুঁত কাজ; কিন্তু সেই নিখুঁত পর্যবেক্ষণটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। খোলা চোখে আকাশ দেখলে মনে হয়, সৌর জগতের গ্রহরা বুঝি ঝাঁক ঝাঁক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে চলেছে। কিন্তু আজ বিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে, এইসব নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে রয়েছে অভাবনীয় রকমের বিপুল পরিসর ও দূরত্ব। সে দূরত্ব ৫০ হাজার বিলিয়ন কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। ওই দূরত্বকে সচরাচর আলোকবর্ষের মাপে ব্যক্ত করা হয়, যাতে করে তুলনামূলকভাবে ছোটো সংখ্যা দিয়ে তাদের সূচিত করা চলে। কিন্তু পরিমাপের এককটা হল আলোর গতিবেগ, যা কিনা সেকেন্ডে তিন লক্ষ

কিলোমিটার। আকাশগঙ্গা নামক যে গ্যালাক্সির মধ্যে আমাদের সৌর জগৎটি রয়েছে, সেই গ্যালাক্সিতে সূর্যের চেয়ে বড়ো ও বেশি উজ্জ্বল ২০০ বিলিয়ন (এক বিলিয়ন মানে একশো কোটি) তারা রয়েছে। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এরকম গ্যালাক্সির সংখ্যা অন্তত ১০০ মিলিয়ন। এই সবকটা তারা সারাক্ষণ চলমান। তার মানে, কোনো বিশেষ মুহূর্তে এই অমেয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাটিকে যদি একবার পুনরাবৃত্ত করাতে হয়, তাহলে অসীম সময় লাগবে। এ অবস্থায় কোনো পর্যবেক্ষণই সম্ভব নয়। তাই জ্যোতিষের সূত্রায়নও অসম্ভব, কেননা জ্যোতিষ মহাকাশে তারা ও গ্রহদের দশার ওপরেই নির্ভর করে।

মানুষ যখন জ্যোতিষ আবিষ্কার করে, সে মহাকাশের পরিসরটাকে বারোটি ভাগে ভাগ করে নেয়। একেকটি ভাগের মধ্যে যেসব গ্রহ, তারকা, নক্ষত্রপুঞ্জ ও রাশিচিহ্ন থাকে, তাদের প্রত্যেকের ওপর একেকটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়। পৃথিবীর চারপাশের পরিসরটিকে এইভাবে স্থায়ী বারোটি ভাগে ভাগ করে নেওয়ার এবং তাদের প্রত্যেকটির ওপর সুনির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাভিত্তিক। শুধু তাই নয়, এ এক দমফাটা হাসির ব্যাপার। আমরা জানি, পৃথিবী দিনে ৫৪০০০ মাইল গতিতে পাক খেয়ে চলেছে। কাজেই আমাদের চারপাশে যে পরিসরকে আর যেসব তারাকে আমরা দেখতে পাই, সেগুলোও পৃথিবীর চলনের সঙ্গে তাল রেখে বদলে বদলে যায়। সুতরাং এই পরিসরের যে কোনো অংশের ওপর একটা সুনির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করা একেবারেই অমূলক। আজ অবধি কেউ কখনো এর সপক্ষে একটাও প্রমাণ দিতে পারেনি।

কুয়োর জল তোলার চাকার মতো সূর্যটাও যেন পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে চলেছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর চারপাশে সূর্যের এই আপাত-পরিক্রমণকে বলা হয় ক্রান্তিবৃত্ত। এই বৃত্তের বেড়টা ক্রান্তিবৃত্তের চলনপথের সাড়ে সাত ডিগ্রি উত্তর আর দক্ষিণে প্রসারিত থাকে। প্রাচীন ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে এই বেড়টাকে সাতাশটা নক্ষত্রপুঞ্জে ভাগ করা হয়েছিল। পরে একেকটা রাশিতে আড়াইখানা করে নক্ষত্রপুঞ্জ বরাদ্দ করা হয়। এই নক্ষত্রপুঞ্জগুলোরও আবার বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, এরকমই বলা হয়। নক্ষত্রপুঞ্জগুলো তিনটি ভাগে বিভক্ত: মনুষ্য, রাক্ষস আর দেব। একই সঙ্গে এরা পুরুষ, নারী আর ক্লীবলিঙ্গও বটে। কোনো কোনোটা চোর, কোনো কোনোটা নিষ্ঠুর, কোনো কোনোটা আবার নীতিপরায়ণ। জাতকের জন্মর সময় চন্দ্র যে নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থান করে, সেই অনুযায়ী জাতকের ওপর তার প্রভাব পড়ে (অর্থাৎ জাতক সেই নক্ষত্রপুঞ্জের স্বভাব পায়)। যদি কোনো জাতক মেয়েলি স্বভাবযুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জের অধীনে জন্ম নেয়, তাহলে সে পুরুষ বা মহিলা যাই হোক না কেন, তার বৈশিষ্ট্য হবে মেয়েলি। পরে এই সাতাশটা নক্ষত্রপুঞ্জকে বারোটা রাশিতে ভাগ করা হয়। তাহলে হিসেব মতো প্রত্যেক রাশির অন্তর্গত নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর যা বৈশিষ্ট্য, রাশিরও সেই একই বৈশিষ্ট্য বরাদ্দ থাকা উচিত। কিন্তু না। রাশিগুলোর আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এমনিতেই গোলানো একটা ব্যাপারকে আরো গুলিয়ে তুলেছে এই কাণ্ড। ধরা যাক, একজন জাতক যে-নক্ষত্রপুঞ্জর অধীনে জন্মেছে সে ওই নক্ষত্রপুঞ্জর স্বভাব পাবে। অথচ যে রাশিতে তার জন্ম, সেই রাশির আবার অন্যরকম বৈশিষ্ট্য। পুরো ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যায় এর ফলে। যেমন মঘা, পূর্বা আর উত্তরা হল মেয়েলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ। কিন্তু যে রাশির সঙ্গে এরা যুক্ত, সেটা হল সিংহ, যার বৈশিষ্ট্য পুরুষালি। তিনটে মেয়েলি উপাদান মিলে কেমন করে একটা পুরুষালি সমগ্র গড়ে উঠবে? একইভাবে, চিত্রা আর স্বাতী, এই দুই মেয়েলি নক্ষত্রপুঞ্জ বিশাখা নামক এক ক্লীব নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে মিলে গঠন করে তুলা রাশি, যার চরিত্র পুরুষালি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, আর অনুরাধা, এই তিনটি ক্লীবলিঙ্গের নক্ষত্রপুঞ্জ মিলে তৈরি হয় বৃশ্চিক রাশি, যা চরিত্রে মেয়েলি! কী করে, কী করে এটা সম্ভব?

রাশি-নক্ষত্রগুলোর মৌল উপাদান নিয়েও এই একই হাস্যকর তালগোল পেকে রয়েছে। আগেই বলেছি, অগ্নি (আগুন), মরুৎ (বায়ু), অপ্ (জল) আর ক্ষিতি (পৃথিবী) এই চারটি হল মৌল উপাদান। মরুৎ-উপাদানের কুম্ভরাশি গঠিত হয়েছে ক্ষিতি-উপাদানের ধনিষ্ঠা, অপ্-উপাদানের শততারকা আর অগ্নি-উপাদানের পূর্বভাদ্রপদ দিয়ে। তার মানে মরুৎ (কুম্ভ) = ক্ষিতি (ধনিষ্ঠা) + অগ্নি। একইভাবে, অগ্নি-উপাদানের ধনুরাশি তৈরি হয়েছে মূল (অপ্), পূর্বশাধ (অপ্) আর উত্তরা (ক্ষিতি) উপাদান দিয়ে। তার অর্থ, দুটি অপ্-উপাদান আর একটি ক্ষিতি-উপাদান মিলে তৈরি হয়েছে অগ্নি! কিসের ভিত্তিতে যে এইসব অল্পবুদ্ধি জ্যোতিষীরা ওপরের এইসব ব্যাখ্যানগুলোকে গড়ে

তুলেছিল কে জানে! রাশি-নক্ষত্রের ঘাড়ে চাপানো এইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এককথায় একেবারেই অর্থহীন।

নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর মধ্যে একটা করে উজ্জ্বল তারা থাকে, যার নিরিখে নক্ষত্রপুঞ্জকে বিচার করা হয়। কাজেই এগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার পিছনে কিছু যুক্তি আছে। এমনকি, নিতান্ত কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও এক লহমার জন্য রাশিদের অস্তিত্বও না হয় মেনে নেওয়া গেল, যেহেতু তাদের সঙ্গে নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু 'ভাবচক্র'র বেলায় কী হবে? ভাবচক্র হল সেই বৃত্ত যার ওপর কোষ্ঠীর বারোখানা রাশিচিহ্ন পাতা হয়, যেগুলো নাকি নক্ষত্রপুঞ্জর বারোটি ছেদবিন্দুকে সূচিত করে। এই বারোটি ভাবের, অর্থাৎ কোষ্ঠীর ছকের ওপরকার এই ছেদবিন্দুগুলোর কিন্তু আদপেই কোনো অস্তিত্ব নেই। বলা হয় এগুলো নাকি জাতকের জন্মকালে নিমেষের জন্য আকাশে উদিত হয়। জন্মমুহূর্তে, ঠিক যেখানে জাতকের জন্ম সেইখানে শিশুটির মাথার ঠিক উপরে উদিত হয় দশম ভাব; আর প্রথম ভাবটির উদয় হয় পূর্ব দিগন্তে; আর এই দুটি ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে উদয় হয় বাকি ভাবগুলোর। এবার দেখুন, প্রতি সেকেন্ডে গড়পড়তা চারটি করে শিশুর জন্ম হয়। সুতরাং প্রতি সেকেন্ডে আকাশে নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা ভাবচক্রেরও উদয় হয়। তা যদি হয় তাহলে মহাকাশ পরিসরের একটা অংশে শিশু ক তার প্রথম ভাবটি পাচ্ছে, আর শিশু খ হয়ত তার পঞ্চম ভাবটি পাচ্ছে এবং শিশু গ হয়ত পাচ্ছে অন্য কোনো ভাব। কাজেই এদের এই আলাদা আলাদা ভাব একে অপরের গায়ে হেলে পড়ে। জ্যোতিষে কিন্তু ধরে নেওয়া হয়, যে ভাবটি গ্রহের পাল্লার মধ্যে পড়ছে শুধু সেই ভাব অনুযায়ী গ্রহদের প্রভাব বদলায়। তা যদি হয় তাহলে একই গ্রহ একই সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবের মধ্যে রয়েছে, এ কল্পনা একেবারেই যুক্তিসম্মত হতে পারে না। কাজেই একই গ্রহ একই সময়ে জাত বিভিন্ন শিশুকে তাদের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন রকমে প্রভাবিত করবে, বিজ্ঞানের বিচারে এটা অসম্ভব।

জন্মসময়

বাবা-মায়ের কাছে শিশুর জন্মসময়ের গুরুত্ব খুবই বেশি, যেহেতু গ্রহগুলো ক্রমাগত নিজেদের অবস্থান বদলায়। জ্যোতিষীদের, আর যেসব বাবা-মা তাদের ওপর আস্থা রাখেন তাঁদের বিশ্বাস, জাতকের জন্মকালের গ্রহদৃষ্টিই তার সারা জীবনকে প্রভাবিত করে ও তার জীবন নির্ধারিত করে দেয়। প্রাচীনকালে যখন ঘড়ি ছিল না, তখন ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য জ্যোতিষীদের একটা চমৎকার অজুহাত ছিল: জাতকের জন্মসময় খেয়াল করতে ভুল হয়েছে। কিন্তু এখন তো আধুনিক ঘড়ি দিয়ে নিখুঁতভাবে জন্মক্ষণ জানা যায়। অথচ আজও কিন্তু জ্যোতিষীরা ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর দায় ঝেড়ে ফেলার জন্য সেই একই অজুহাত দেন, অর্থাৎ জাতকের জন্মসময় ঠিক নেই। তার ওপর জন্মক্ষণ নিয়ে জ্যোতিষের একেক বইতে একেকরকম মত রয়েছে। জ্যোতিষীদের সেমিনারে তা নিয়ে জোর বাদবিতণ্ডা হয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু জন্মক্ষণ বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা নিয়ে জ্যোতিষীদের মধ্যে মতের কোনো মিল নেই। আর বলা বাহুল্য, কোনো মতের সপক্ষেই কোনো বৈজ্ঞানিক সমর্থন দর্শানো হয় না। জন্মক্ষণ যে একজন মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, এই মতের অযৌক্তিকতা প্রসঙ্গে এই উদাহরণটির দিকে নজর দেওয়া যাক। বছর কয়েক আগে মুম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের হাসপাতালে দুটি যমজ শিশুকন্যার জন্ম হয়। প্রথম বাচ্চাটিকে গর্ভ থেকে প্রসব করানো হল; কিন্তু দ্বিতীয় বাচ্চাটি গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই চন্দ্র অন্য একটি নক্ষত্রপুঞ্জে প্রবেশ করল। প্রসিদ্ধ সেই স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের মতে, সেই কারণেই দুটি বাচ্চার গায়ের রঙ

প্রাচীনকালে যখন ঘড়ি ছিল না, তখন ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য জ্যোতিষীদের একটা চমৎকার অজুহাত ছিলঃ জাতকের জন্মসময় খেয়াল করতে ভুল হয়েছে। কিন্তু এখন তো আধুনিক ঘড়ি দিয়ে নিখুঁতভাবে জন্মক্ষণ জানা যায়। অথচ আজও কিন্তু জ্যোতিষীরা ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর দায় ঝেড়ে ফেলার জন্য সেই একই অজুহাত দেন, অর্থাৎ জাতকের জন্মসময় ঠিক নেই।

আলাদা হয়ে গেল। অথচ এটা কিন্তু ভালো করেই জানা আছে যে, দেহের আকার, আকৃতি, গায়ের রঙ এবং এই ধরনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিক করে দেয় জিন আর ক্রোমোসোম। তাই জন্মকালে নক্ষত্রপুঞ্জ বদলে গেল বলে বাচ্চার গায়ের রঙ বদলে গেল, এটা হতেই পারে না। যমজরা একই ডিম থেকে জন্মাতে পারে, আবার দুটি ডিম থেকেও জন্মাতে পারে। এখানে যে যমজদের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, স্পষ্টতই তারা দুটি ডিম থেকে জন্মেছিল। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে জ্যোতিষীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন সময়টাকে জন্মক্ষণ বলে বিবেচনা করা উচিত এবং কেন ওই বিশেষ সময়টাকেই জন্মক্ষণ বলে গণ্য করা উচিত। তিনি এই সমস্যাটার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা হয়ত সরল, তার মধ্যে হয়তো সূক্ষতার অভাব ছিল; কিন্তু তাঁর মূল ভাবনাটার মধ্যে কোথাও গলদ ছিল না। 'কোন সময়টাকে জাতকের জন্মক্ষণ বলে বিবেচনা করতে হবে?'– এই প্রশ্নটাকে আরো সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁতভাবে তোলা যায় নিম্নলিখিতভাবে।

ফ্যালোপিয়ান নলের মধ্যে যে মুহূর্তে ডিম আর শুক্রাণুর মিলন হয়, তখনই নতুন প্রাণের প্রথম কোষটির জন্ম হয়। কাজেই ওই মুহূর্তটিই একজন মানুষের জন্মক্ষণ হওয়া উচিত। কিন্তু ঠিক কোন সময় এই ঘটনাটি ঘটে, তা জানা অসম্ভব। কারণ যে শুক্রাণুটি গর্ভে প্রবেশ করল, তা ফ্যালোপিয়ান নল বেয়ে ডিমের কাছে পৌঁছতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে, কখনো কখনো পুরো একটা দিনও লেগে যায়।

গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের বয়স নির্দিষ্ট কয়েক মাস পেরিয়ে গেলে আইনত গর্ভপাত করা যায় না, কারণ ওই সময়ে স্বাভাবিকভাবে যদি ওই বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হত, তার বাঁচার সম্ভাবনাই থাকত বেশি। এই অর্থে, গর্ভস্থ শিশু যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে বেঁচে থাকার সামর্থ্য অর্জন করে, সেই সময়টাকেই কি শিশুর জন্মক্ষণ ধরা উচিত?

বাচ্চা যখন জন্মায়, তার মাথাটা আগে বেরোয়। জন্ম ঠিক রকেট উৎক্ষেপণের মতো ব্যাপার নয়। ১০, ৯, ৮, ৭... করে রকেটের কাউন্টডাউন হওয়ার মতো করে পূর্বনির্দিষ্ট মুহূর্তে বাচ্চা জন্মায় না। অনেক সময়েই মাথাটা বেরিয়ে আসার বেশ কয়েক মিনিট পরে পা দুখানা ঠেলে বেরোয়। তাহলে বাচ্চার জন্মসময় কোনটা? যখন মাথাটা বেরিয়ে আসে, তখন? নাকি যখন পা দুখানাও বেরিয়ে আসে, তখন? এবং কেন? আরেকটা কথা– যদি ওই পর্বের মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো পরিবর্তন হয়, তাহলে কোনটি জাতকের জন্মতারকা বলে গণ্য হবে?

কোনো কোনো বাচ্চা আবার জন্মানোর সময় আগে তার পা দুটো বেরিয়ে আসে, মাথাটা বেরোয় পরে। সুতরাং আবার উঠে পড়ে সেই প্রশ্ন– এই দুটো মুহূর্তের কোন্‌টা শিশুটির জন্মকাল? এবং কেন?

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও শিশু তার মায়ের দেহের অঙ্গ হয়েই থাকে। চিকিৎসক নাভিরজ্জু কেটে শিশুকে মায়ের দেহ থেকে আলাদা করেন। সেই মুহূর্ত থেকে শিশু তার স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করে। তাহলে ওই মুহূর্তটিই কি তার জন্মর উপযুক্ত কাল নয়?

প্রত্যেক বাচ্চা জন্মের ঠিক পরপরই কেঁদে ওঠে। যে বাচ্চা তখনো পৃথিবীর কোনো সুখ, কোনো দুঃখ অনুভব করেনি, সে কাঁদে। সে কেঁদে ওঠে শারীরিক প্রয়োজনে, কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণে নয়। গর্ভের মধ্যে থাকা অবস্থায় তার ফুসফুস দুটি চেপ্টে থাকে, যেহেতু তখন তো তাকে নিঃশ্বাস নিতে হয় না। জন্মাবার পর যখন নাভিরজ্জু কেটে তাকে তার মায়ের দেহ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন সে কাঁদে। তার মানে, সেই বাচ্চাটি তার মায়ের গর্ভের বাইরে সেই প্রথম নিঃশ্বাস নিল। শিশুটি যে মুহূর্তে কেঁদে উঠল, সেই মুহূর্তটিকেই আমরা তার জন্মমুহূর্ত বলতে পারি কি পারি না?

কখনো কখনো স্বাভাবিক প্রসব হয় না। তখন বাচ্চাকে সিজারিয়ান অপারেশন করে গর্ভ কেটে বার করে আনতে হয়। সে অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত সময়টা নির্ধারণ করা হয় গর্ভবতী মহিলার শারীরিক অবস্থা এবং তাঁর চিকিৎসকের মত অনুযায়ী। অস্ত্রোপচারটা যেহেতু আগে থেকে পরিকল্পিত, তাই তাকে দু-একদিন এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট মহিলাটি এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন চেষ্টা করেন যাতে অস্ত্রোপচারটা একটা শুভ সময়ে হয় (সম্ভব হলে হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে যে সাড়ে তিনটি দিন সবচেয়ে শুভ তারই কোনো একটা দিনে)। যে চিকিৎসক সবচেয়ে শুভ সময়টিতে অপারেশন করেন, তিনিই অতএব বাচ্চাটির অতি সফল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে দেন। এর কাছে কোথায় লাগে স্বয়ং ব্রহ্মদেব! এই 'শুভ মুহূর্ত' ধারণাটির ধাপ্পাবাজিটা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি প্রসূতি সদনের বিশাল অপারেশন কক্ষে একই সময়ে একই জায়গায়

তিনজন মহিলার অপারেশন করে তিনটি শিশুর জন্ম দেওয়া যায়। খুব বড়োলোকের বাড়ির এক মহিলার, মধ্যবিত্ত ঘরের এক মহিলার এবং এক শ্রমিকের স্ত্রীর একটি করে বাচ্চা হল। এই তিনটি বাচ্চার ভবিষ্যৎ যে হুবহু একই রকম হবে না, সেটা বোঝার জন্য খুব বেশি যুক্তিবিজ্ঞান জানার প্রয়োজন হয় না।

কার্যকারণবাদী ভবিষ্যদ্বাণী

বিজ্ঞান বলে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র যে তত্ত্বপ্রস্তাব পেশ করে, তার তৃতীয় অংশে জোর গলায় বলা হয় যে, কোষ্ঠী গণনা করে একজন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবন কোন পথে চলবে, তা বলে দেওয়া যায়। এ বিষয়ে তিন ধরনের দাবি পেশ করা হয়। প্রথমটি হল, কোষ্ঠীর সাহায্যে ভাগ্য ব্যাখ্যা করা যায়। এ যেন রেললাইনের ওপর দিয়ে চলমান এক রেলগাড়ি। রেলগাড়ির পক্ষে কোনোভাবেই যাত্রাপথ বদলানো সম্ভব নয়, কিন্তু যাত্রাপথে তা এমন সব চিহ্ন দেখতে পায় যা তাকে জানিয়ে দেয়, সামনেই আসছে একটা স্টেশন কিংবা একটা সুড়ঙ্গ কিংবা একটা বাঁক। চিহ্নটা যদি বিপদের সঙ্কেত দেয় তাহলে রেলগাড়ির চালক কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি থামিয়ে দিতে পারেন। একজন মানুষের জীবন তার ভাগ্যের রেলপথ ধরে চলে, যা বদলানোর সাধ্য ওই ব্যক্তির নেই। তার কোষ্ঠী কিন্তু সম্ভাব্য বিপদ (বা সাফল্য) সম্বন্ধে তাকে আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দেয়, যার ফলে সে আরো ভালোভাবে ভবিষ্যতের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে পারে। এই গোটা ছকটা একজন মানুষকে ভাগ্যের হাতের পুতুল বানিয়ে ছাড়ে। নিজের চেষ্টায় নিজের জীবনে কিংবা সমাজে কোনো পরিবর্তন আনবার সমস্ত সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে তা ওই ব্যক্তিকে এক অসহায় পরনির্ভরতার মধ্যে ঠেলে দেয়। কোষ্ঠী মানুষের মনে একটা অবৈজ্ঞানিক ধারণা জাগিয়ে তোলে। যেমন ধরুন স্ত্রী-সাক্ষরতার কথা। বিগত দু হাজার বছরে এ দেশের মহিলাদের কোষ্ঠীতে শিক্ষার সুযোগের কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু গত শ-খানেক বছর ধরে সাবিত্রীবাঈ ফুলে ও অন্যান্য অনেক সমাজ-সংস্কারকদের প্রয়াসে সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ অবারিত হয়েছে। এইসব মহিলাদের কোষ্ঠীতে কি এবার শিক্ষা সংক্রান্ত চিহ্নগুলি ফুটে উঠল, যেগুলো আগে গরহাজির ছিল? স্বাধীনতার আগে ভারতীয়দের গড়পড়তা আয়ু ছিল তিরিশ বছর। গত ষাট বছরের প্রয়াসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষাট। তার মানে কি এই যে ভারতীয়ের কোষ্ঠীতে মৃত্যুর জন্য দায়ী গ্রহগুলো তাদের ছক বদলে ফেলে আরো এগিয়ে গিয়ে ভারতীয়দের প্রত্যাশিত আয়ুকে ঠেলে তুলে দিয়েছে ষাটে?

জ্যোতিষের আরেকটা জোরালো বক্তব্য হল, কোষ্ঠী শুধু যে ভবিষ্যতে কী আছে তার ইঙ্গিত দেয় তা নয়, কোষ্ঠী এমনকি জীবনকে নিয়ন্ত্রণও করতে সক্ষম। জলের ট্যাঙ্কে যে ভ্যাল্‌ভ থাকে তা এর একটা ভালো উপমা হতে পারে। জলেরই মতো, ভাগ্যের ট্যাঙ্কে থাকে একজন মানুষের প্রারব্ধ (প্রারব্ধ মানে হল, আগের জন্মর যেসব সুকৃতি ও অপকৃতির ফলে বর্তমানের এই জন্ম সম্ভব হয়েছে এবং যা ব্যক্তির জীবনে শুভ-অশুভর বরাদ্দকে নিয়ন্ত্রণ করে)। ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে ভ্যাল্‌ভ। ঠিক একইভাবে কোষ্ঠীর গ্রহগুলোও ঠিক সময়ে ঠিক মাত্রায় প্রারব্ধর ফল ছাড়ে। জ্যোতিষের তিন নম্বর জোরালো ঘোষণাটি আর এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে বলে যে, কার্যত গ্রহগুলোই হল ব্যক্তিমানুষের জীবনের নিয়ন্তা। একজন মানুষের জীবনে কখন কী ঘটবে, এবং কেমন করে ঘটবে, সেসবই নির্ধারিত হয় গ্রহগুলোর প্রভাবে। জ্যোতিষতত্ত্বের প্রস্তাবের এই তিন নম্বর অংশটা ব্যক্তিমানুষের মনকে পরাভববাদী ও নিয়তিবাদী দর্শনে আচ্ছন্ন করে। একজন মানুষ তার জিন আর ক্রোমোজোমগুলি পায় তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে। জীবনে তার অগ্রগতি নির্ভর করে সে কোন সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে বড় হচ্ছে তার ওপর। অথচ তথাকথিত জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে জীবনের এই সব দিকের কোনো ঠাঁই নেই।

দ্রঃ মারাঠি থেকে ইংরেজিতে (Irrationality of Astrology) অনুবাদ করেছিলেন সুমন ওক। তারই বাংলা অনুবাদ এটি।

উমা

বিস্কুট বনাম ইউরিয়া মেশানো মুড়ি

গৌতম মিস্ত্রি

(গত সংখ্যার পর)

বিস্কুটের প্যাকেটের ওপরে ছাপা 'ট্রান্স ফ্যাট বিহীন' একটা বড় ধোঁকা। অপেক্ষাকৃত কমদামি লেবেলহীন বিস্কুটে যেমন ট্রান্স ফ্যাটের উপস্থিতি থাকাই স্বাভাবিক, আবার দামি প্যাকেটজাত বিস্কুটের প্যাকেটে ট্রান্স ফ্যাট নেই লেখা থাকলেও সেটা শূন্য ট্রান্স ফ্যাট হবার গ্যারান্টি নেই। তর্কের খাতিরে ট্রান্স ফ্যাট নেই ধরে নিলেও, ১০০ গ্রাম বিস্কুটে গড়পড়তা ৮ গ্রাম সম্পৃক্ত ফ্যাট ও ৪০০ ক্যালোরি শক্তি থাকে। দৈনিক ১২-২০ গ্রাম সম্পৃক্ত ফ্যাট গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা ১৫০ গ্রাম বেকারির খাবার খেলেই পূর্ণ হয়ে যাবে, তারপর সারাদিনে খাবার জন্য পড়ে থাকবে কেবল শুকনো রুটি। ভারতের মতো বড় স্ন্যাক্সের বাজার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১২ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতবাসী বছরে প্রায় ৪০ লাখ টন স্ন্যাক্স খায়। কে বা কারা ব্যবহার করছে, এ ব্যাপারে আশ্চর্য নীরবতা থাকলেও বনস্পতি (ট্রান্স ফ্যাটের প্রধান উৎস) প্রস্তুতকর্তারা জানাচ্ছেন, আমাদের দেশে ১১ লক্ষ টন বনস্পতি বিক্রি হয়, এর সিংহভাগটাই ফাস্ট ফুড ও বেকারি সংস্থাগুলো ব্যবহার করে। সরাসরি বনস্পতি ব্যবহার না করলেও বেকিং পদ্ধতির অঙ্গ হিসাবে গন্ধ দূর করার জন্যে একে ব্যবহার করা হয়। যে প্রক্রিয়ায় করা হয় তাকে বলে ডিওডোরাইজেশন। এতে ১৮০ ডিগ্রি থেকে ২৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা লাগে। আর তাতেই উদ্ভিজ্জ তেলের নিরীহ লিনোলেইক আর লিনোলেনিক অ্যাসিড ট্রান্স আইসোমারে পরিণত হয় (Ratnayake *et al.*, 1997; Martin *et al.*, 2008)। কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি বেকিং করার সময় সেগুলো যাতে নমনীয় না হয়ে যায় তার জন্য 'বেকারি সরটেনিং' নামে এক প্রক্রিয়ায় তরল উদ্ভিজ্জ তেলে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন অণু যুক্ত করে নেওয়া হয়। বেকারির খাবার আক্ষরিক অর্থে ট্রান্স ফ্যাট বিহীন করা আদৌ সম্ভব কিনা সংশয় আছে। এই জন্যই ০.৫ শতাংশের কম ট্রান্স ফ্যাট থাকলেই সেটাকে শূন্য ট্রান্স ফ্যাটের মান্যতা দেওয়া হয়েছে আমেরিকায়। আমাদের দেশের ১৯৫৫ সালের প্রিভেনশন অভ ফুড অ্যাডালটারেশন আইন মোতাবেক প্রতি প্যাকেটে (সারভিং) ০.২ গ্রামের কম ট্রান্স ফ্যাট ও বেকারি সরটেনিং হলেই প্যাকেটের গায়ে 'ট্রান্স ফ্যাট মুক্ত' লেখা যাবে। ভারতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী ভোজ্য তেলে ট্রান্স ফ্যাটের মাত্রা ২ শতাংশের কম হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও দিল্লির সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টের (CSE) অনুসন্ধানে বেশ কিছু উদ্ভিজ্জ তেলে ট্রান্স ফ্যাটের মাত্রা অধিক পক্ষে ২৩ শতাংশ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বিদেশে ট্রান্স ফ্যাট নিয়ে সচেতনতা দেখা গেলেও, আমাদের দেশে এ নিয়ে কোনো হেলদোল নেই। একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান জানাচ্ছে-- একজন ভারতীয় দৈনিক গড়পড়তা ১৬৭ গ্রাম বেকারির খাবার, মিষ্টি, প্যাকেটজাত চটজলদি খাবার খেয়ে থাকেন। এর মধ্যে লেবেল ছাড়া খোলা খাবারই বেশি। অথচ সেই সব খাদ্যের উপাদান ও গুণাগুণ বিষয়ে কোনো সমীক্ষাই করা হয় নি। কিছুটা লোকদেখানো অভিভাবকসুলভ খবরদারির জেরে আর কিছুটা বাজারি প্রতিযোগিতার কারণে ট্রান্স ফ্যাট ব্রাত্য হলেও বেকারির খাবারে থেকে যাচ্ছে অনেক অনুচ্চারিত দুশমন। এমনিতেই বিস্কুট ও বেকারির খাবারের গুটিকতক অবতারের গায়ে প্যাকেটের আবরণ থাকে। অধিকাংশই হাই ফ্যাশন ব্র্যান্ডের দোকানের কাঁচের শো কেসে সাজানো থাকে; প্যাকেটই নেই তো লেবেল কোথা পাই। যেগুলোতে প্যাকেট থাকে, সেগুলো প্যাকেট ছেঁড়ার পরে বড়জোর নাম ধাম ও দাম দেখেই ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। আতস কাচ দিয়ে কিছু পড়ে নিতে পারলেও

লেখা থাকে না ট্রান্স ফ্যাটের মতো সমগোত্রীয় অন্যান্য ভিলেনের হাল হকিকত। এর মধ্যে পারঅক্সাইড সংখ্যা, টোটক্স সংখ্যা অন্যতম। এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্যাকেট থেকে খোলার পর খোলা হাওয়ায় বিস্কুট সহ বেকারির খাবার কতটা বিস্বাদ ও ক্ষতিকারক (র‍্যান্সিড) হয়ে উঠতে পারে, সেই ক্ষমতা নির্দেশ করে। যত বেশি পারঅক্সাইড ও টোটক্স সংখ্যা, তত বেশি হাওয়ার জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সংস্পর্শে বেকারির খাবারের উপকারী অসম্পৃক্ত ফ্যাটের র‍্যান্সিড হয়ে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যাবার সম্ভাবনা। একটি উচ্চমানের সমীক্ষা অনুযায়ী, মোট ফ্যাটের (এর মধ্যে সম্পৃক্ত ফ্যাটই প্রধান) ক্রমবর্ধমান অস্তিত্ব অনুযায়ী খাবারগুলো হল: পাউরুটি, নুডলস, বার্গার, বানরুটি, বিভিন্ন রোল, শিঙাড়া, পেস্ট্রি, বিস্কুট, কাটলেট, পাফ, কেক। ট্রান্স ফ্যাট কম থেকে বেশি আছে, এমন ক্রম তৈরি করলে এই তালিকাটা হবে এই রকমঃ বার্গার, নুডলস, বানরুটি, রোল, শিঙাড়া, কাটলেট, পাউরুটি, প্যাস্ট্রি, কেক, পাফ। অর্থাৎ কেকে সর্বাধিক ফ্যাট (২৫.৩৬ শতাংশ) ও পাফে সর্বাধিক ট্রান্স ফ্যাট (৩০ শতাংশ) পাওয়া যাবে। একটি ১০০ গ্রামের কেক খেলে দৈনিক প্রয়োজনের (১৮০০ ক্যালোরির হিসাবে) পুরো কোটার ১০০ শতাংশ মোট ফ্যাট (২০ গ্রাম), মোট সম্পৃক্ত ফ্যাট (৯.৪ গ্রাম) এবং কোটার দেড়গুণ ট্রান্স ফ্যাট (১.৫ গ্রাম) খাওয়া হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী (২০০৩) দৈনিক ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণের মাত্রা ২.২ গ্রামের নীচে (মোট ক্যালোরির ১ শতাংশ) রাখতে পারলে ভাল।

বেকারির ব্লো ২: বেকারির কাঁচামাল ময়দা একটি অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাত শস্যদানা

ব্রাউন ব্রেডের স্বাদ অপ্রিয় হলেও বিজ্ঞাপনের আর প্রচারের দৌলতে সাদা শয়তান হিসাবে ময়দা এখন বেশ একঘরে। বাজার ছেয়ে যাওয়া নরম তুলতুলে বাদামি রং করা ময়দার পাউরুটি স্বাস্থ্যসচেতন বাঙালি এখন সওদা করে। কিন্তু পাঁচমেশালি লাল আটার (মাল্টিগ্রেন) কেক, কুকিজ আর বিস্কুট পাই কোথা? ময়দা আর চিনির 'জি আই' বা গ্লাইসেমিক ইনডেক্সে বিশেষ কোনো ফারাক নেই। শর্করা জাতীয় খাবার খাওয়ার পর রক্তে কত তাড়াতাড়ি আর কত পরিমাণে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়বে সেটা যথাক্রমে খাবারের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স আর গ্লাইসেমিক লোড দিয়ে বোঝা যায়। উৎস মানুষের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ (৩৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯) সংখ্যায় স্বাস্থ্যকর শর্করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ছাপা পত্রিকা হাতের কাছে না থাকলে ওয়েব সাইটে পড়ে নেওয়া যেতে পারে। বিস্কুটের চেয়ে তাই হাতেগড়া রুটি, চিঁড়ে বা মুড়ি স্বাস্থ্যকর। রুটি, চিঁড়ে বা মুড়ি শর্করাপ্রধান খাদ্য। এই খাবারকে সুষম করার জন্যে এর সাথে ডাল, সবজি, ছোলা বা বাদাম মেশালেই খাবার জন্য স্যাচুরেটেড ফ্যাটবিহীন শর্করা, প্রোটিন, ফাইবার, খনিজ পদার্থ আর ভিটামিন পাওয়া যাবে। খেয়াল রাখতে হবে, ডাল, সবজি, ছোলা আর বাদাম যেন ভাজা না হয়।

বেকারির ব্লো ৩:

বিস্কুট, পাউরুটি, কেক, কুকিজ ইত্যাদি তন্তুবিহীন (ফাইবার নেই) খাবার। এতে পরিশোধিত ময়দা ছাড়া পাওয়া যাবে অনেকটা চিনি, সোডিয়াম (বেকিং পাউডার) আর প্রচুর ক্যালোরি। বেকিং পদ্ধতিতে খাবার প্রস্তুত করার জন্য ভিটামিন উধাও হয়ে যায়। ট্রান্স ফ্যাটের কথা তো 'হত ইতি গজ'-র মতো অর্ধসত্য! খিদে পেলে যাঁরা নিরীহ খাবার বলে বিস্কুট খাচ্ছেন, তাঁদের পেটে ঢুকছে কেবল তন্তু (ফাইবার) ও ভিটামিনবিহীন 'ফাঁকা শক্তি' বা 'এম্পটি ক্যালোরি'। বুঝতে পারছেন না, ওজন কমছে না কেন, ভুঁড়ি ক্রমেই কেন স্ফীত হচ্ছে! বেকারির খাবারের মধ্যে বিস্কুট আর পাউরুটি অন্যান্য খাবার যেমন কেক, কুকিজ, প্যাটিস, পাই, মাফিন, ডোনাট, পিৎজার চেয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে কম আপত্তিকর। সময়ে অসময়ের চটজলদি খাবার হল বিস্কুট। এর আপাতনিরীহ বলে একটা ভ্রান্ত আবেদন আছে। তাই এই আলোচনায় বিস্কুটকে মাইক্রোস্কোপের তলায় টেনে আনা হয়েছে। বেকারির অন্য খাবারগুলো বিস্কুটের চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক। চিঁড়ে মুড়ি কেবল প্রাকৃতিক শর্করা ঠাসা খাবার, সঙ্গে ছাতু, ডাল, সবজি ইত্যাদি এগুলোকে সুষম করে তোলে। অপরদিকে বিস্কুটে ব্যবহার হয় শস্যদানার প্রধান শর্করা হিসাবে কৃত্রিম উপায়ে ফাইবার বাদ দেওয়া সাদা ময়দা, ইস্ট, বেকিং পাউডার, পরিশোধিত চিনি, মাখন, সম্পৃক্ত জৈব ফ্যাট ও অনেক ক্ষেত্রে সস্তা ও অধিক সময়ের জন্য স্বাদ অপরিবর্তিত থাকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার জন্য আইন মেনে কিঞ্চিৎ ট্রান্স ফ্যাট। ক্যালোরি বা শক্তিতে ভরপুর বিস্কুট তেমন করে পেট ভরায় না, খিদে পেলে অনেকটাই খাওয়া হয়ে যায়। সারাদিনের ক্যালোরির কোটা তিন চারশো গ্রাম বিস্কুট খেলেই পূর্ণ হয়ে যায়।

কুকিজ বাদ দিলে বিস্কুট প্রধানত তিন প্রকারের: (১) মুচমুচে মিষ্টি বিস্কুট (যেমন পার্লে জি)। এতে বেশি মাত্রায় ফ্যাট আর চিনি থাকে। (২) অল্প মিষ্টি বিস্কুট (যেমন মারি) অল্প চিনি ও কম ফ্যাটযুক্ত এই বিস্কুট একটু শক্ত হয় আর কম মুচমুচে হয় ৩) ক্র্যাকার ও নোনতা বিস্কুট। এগুলোয় বেশি সোডিয়াম, বেশি ফ্যাট থাকে। প্রতিটি খাদ্যবস্তুর গুণমান নিয়ন্ত্রক সংস্থার (ব্যুরো অভ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস) অনুমোদিত বিস্কুটের কাঁচামালের তালিকা বেশ দীর্ঘ ও ভীতিপ্রদ। কী নেই এতে? বনস্পতি, মার্জারিন, জমানো দুধ বা কনডেন্সড মিল্ক, ভিনিগার... এই কয়েকটা পড়ার পরে ধৈর্য হারিয়ে যেতে পারে। পুরো লিস্টটা ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। ব্যুরো অভ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড-এর আমলারা অনুমোদনের ফর্দ নিয়ে বাজারের কত কিলোগ্রাম বিস্কুটের গুণমান পরীক্ষা করতে পারেন, তাতে সংশয় আছে। একটি বেসরকারি অনুসন্ধানে জানা যাচ্ছে, বেশ কিছু বিস্কুটের 'অ্যাসিডে অদ্রবণীয় ছাই' বা 'অ্যাসিড ইনসলিউবল অ্যাশ'-এর পরিমাণ স্বাস্থ্যকর মাত্রার ওপরে থাকে। অ্যাসিড ইনসলিউবল অ্যাশ বিস্কুটের সিলিকার ও সমগোত্রীয় অপাচ্য ক্ষতিকর খাদ্যাংশের উপস্থিতি নির্দেশ করে। বিস্কুটের মুচমুচে বৈশিষ্ট্য এর শুষ্কতা আর বেশি ফ্যাটের কারণে হয়। নেতিয়ে যাওয়া বিস্কুটে জলীয় বাষ্প মিশে গিয়ে বিস্কুটে রোগজীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে বলে প্রতিবেদনের বক্তব্য। সুগারের ভয়ে অনেকেই নোনতা আর ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট খেয়ে যাচ্ছেন সকাল সন্ধ্যে। বিস্কুটের প্যাকেটে খুদে লেখা আতস কাচ দিয়ে পড়ে নিলে বুঝতে পারা যাবে এই ধরনের বিস্কুটে চিনি কম থাকলেও ফ্যাট থাকে দ্বিগুণ। ঐ অতিরিক্ত ফ্যাট ক্র্যাকার বিস্কুটের চকচকে চেহারা দেয়, মুখরোচক করে। ১০০ গ্রাম ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট আমাদের দৈনিক সম্পৃক্ত ফ্যাটের কোটা পূর্ণ করে দেয়। কে না জানে যে, সমান ওজনের চিনির চেয়ে ফ্যাটের ক্যালোরির সংখ্যা দ্বিগুণ! অর্থাৎ ক্রিম ক্র্যাকারের স্বাদ মিষ্টি না হলেও কম মিষ্টির অন্যান্য বিস্কুটের (মারি) চেয়ে এতে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি ক্যালোরি খাওয়া হয়ে যায়। খড়ের ওপরে শাকের আঁটির বোঝার মতো নোনতা বিস্কুটের নুনের ছিটে জিভে জল ঝরালেও সোডিয়ামের কথাটা খেয়াল না রাখলে চলে না। বেকিং পাউডারের সোডিয়ামের বোঝার ওপর নোনতা বিস্কুটের অতিরিক্ত নুন উচ্চরক্তচাপে ভোগা ব্যক্তিদের কাছে বিষতুল্য। একজন সুস্থ ব্যক্তির দৈনিক নুন গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা ১.৫ থেকে ৩.৫ মিলিগ্রাম। নুন খাওয়া সীমার মধ্যে রাখতে চাইলে রান্নার সময়ে ডাল সবজিতে যেটুকু নুন মেশানো হয় তার বাইরে নুন খাওয়া চলে না। অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর মতো বিস্কুট উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি হয়ে গুদামঘরে মজুত থাকে, কখনও যেন ডিমান্ডের চেয়ে সাপ্লাই লাইন ক্ষীণ হয়ে না যায়। স্বাদে ও গন্ধে অনেকদিন ধরে অবিকৃত রাখার জন্য সেই বিস্কুটে তরল জৈব অসম্পৃক্ত তেলের কিছুটার পরিবর্তে ট্রান্স ফ্যাট মেশাতেই হয়। তাই সযত্নে আইনের ফাঁক রাখা আছে। সেই বিশুদ্ধ (!) মতে 'ট্রান্স ফ্যাটবিহীন বিস্কুট' সত্যিকারের 'শূন্য ট্রান্স ফ্যাট' হয়ে উঠতে পারে না। আলাদা করে গ্লুকোজ খাওয়াটা নির্বুদ্ধিতা, কারণ মারাত্মকভাবে অসুস্থ না হয়ে পড়লে ভাত রুটি, চিঁড়ে মুড়ি বা যে কোনো শর্করা জাতীয় খাবার পেটে গেলে নিমেষের মধ্যে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ORG-MARG সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে বিক্রিত বিস্কুটের ৬৫ শতাংশই গ্লুকোজ বিস্কুট। এটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই, গ্লুকোজ বিস্কুটে শর্করা ২২ থেকে ২৭ শতাংশ থাকলেও গ্লুকোজ থাকে মাত্র ১.৭ শতাংশ (বেকম্যানস গ্লুকো গোল্ড) থেকে ৩.৭ শতাংশ (ব্রিটানিয়া টাইগার)। গ্লুকোজ বিস্কুটের লেবেলের এই বিভ্রান্তি নিয়ে চাপানউতোর কম হয় নি! থাক সে প্রসঙ্গ। সাদাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের দুনিয়ায় কালো বিস্কুটের আবেদন এক পরম আশ্চর্য! কী দিয়ে তৈরি হয় এই কালো বিস্কুটের ভাল অংশটি? ওগুলো আসলে নিয়ন্ত্রিতভাবে আধপোড়া চিনি, মিল্ক পাউডার, নারকেল কোরা, চকোলেট আর ময়দা। বেকারিতে ফেলে দেওয়ার যোগ্য পোড়া অখাদ্য অংশগুলোকে আধুনিক রন্ধনপ্রণালী কেমন লোভনীয়ভাবে পরিবেশন করে যাচ্ছে। আমাদের দেশে খোলা বিস্কুটের ওপর নজরদারি একরকম অসম্ভব, প্যাকেটজাত বিস্কুটের লেবেলে উপাদান সম্পর্কে দেখনদারি কিছু লেখা থাকে আণুবীক্ষণিক হরফে। সেই তথ্য অসম্পূর্ণ। বিস্কুটের উপাদানে ফাইবার, জলীয় অংশ, পারঅক্সাইড সংখ্যা, স্বাদ-রঙ-গন্ধবর্ধক রাসায়নিকের ধরন ও মাত্রা (প্যাকেটের লেবেলে কেবল লেখা থাকে 'অনুমোদিত রাসায়নিক') সম্পর্কে লেবেল আশ্চর্যভাবে নীরব। অনেকের ধারণা, ডিজেস্টিভ বিস্কুটের উপাদানের সোডিয়াম বাই-কার্বনেট (বেকিং পাউডার, খাবার সোডা) হজমে সাহায্য

করে। এটি আর এক মিথ্যা। খাবার সোডা পাকস্থলীর জলের সংস্পর্শে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করে, ঢেঁকুর তুলে আমরা পেট হাল্কা করে স্বস্তি পাই। বিস্কুটের ক্ষেত্রে এমনটা হবে না। বেক করার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয় ঠিকই, তবে সেটা বিস্কুটকে হাল্কা-ফুল্কা আর মুচমুচে করার কাজে লাগে। যুগ যুগ ধরে আমরা বিস্কুট খেয়ে আসছি, কেউ কোনো ভ্রূ কোঁচকায় নি, কেউ কোনো প্রমোশনও করে নি। আজ হঠাৎ বিস্কুট কোম্পানিগুলো 'ট্রান্স ফ্যাটবিহীন', 'এক্সট্রা ফাইবারওয়ালা', 'প্রোটিন সমৃদ্ধ', 'ভিটামিন ও মিনারেল মেশানো' বলে তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। 'ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়' কী? একটু তলিয়ে দেখা যাক নব কলেবরের এই বিস্কুটের 'এক্সট্রা' জিনিসগুলো আসলে কী? বিস্কুটের প্রধান উপাদান হল ময়দা, ধবধবে সাদা অতি পরিশোধিত শস্যবীজ গমের আটা। ময়দা প্রস্তুত করার সময় গমের ওপরের হাল্কা বাদামি দুটো আস্তরণ (ব্রান ও জার্ম) বর্জন করা হয়, পড়ে থাকে অধিক গ্লাইসেমিক ইনডেক্সযুক্ত এন্ডোস্পার্ম। শস্যদানার ভিটামিন আর ফাইবার ঐ ওপরের দুটো আস্তরণের সাথে বর্জিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বিস্কুট তৈরির জন্য প্রথমে শস্যদানার প্রাকৃতিক ফাইবার ও ভিটামিন ফেলে দিয়ে পরে কৃত্রিম ফাইবার ও রসায়নাগারে অজৈব উপায়ে তৈরি সিনথেটিক ভিটামিন মেশানো হচ্ছে। সিনথেটিক ভিটামিনের কর্মক্ষমতা নিয়ে ঘোর সংশয় আছে। আজকাল ওট সমৃদ্ধ, মাল্টিগ্রেন ইত্যাদির চটকে বিস্কুট বিকোচ্ছে। ঐ বিজ্ঞাপনের চটকের ঘোর কেটে গেলে মোট ক্যালরি, চিনি, শর্করার ও সম্পৃক্ত ফ্যাটের মাত্রা খেয়াল করলে দেখা যাবে, সাধারণ বিস্কুটের সঙ্গে এই বিশেষ বিস্কুটের কোনো পার্থক্য নেই। সাধারণত বিস্কুট মিষ্টি স্বাদের হয়। এতে যে সর্বোচ্চ গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের চিনি থাকে সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে সচেতন আর ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি চিনি এড়ানোর জন্য মারি ও ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট খাবার আগে খেয়াল করবেন, ঐ বিস্কুটগুলো মোটেই চিনি ছাড়া নয়। বরং ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটে ১০০ শতাংশ অতিরিক্ত সম্পৃক্ত ফ্যাট আর ২০ শতাংশ অতিরিক্ত ক্যালরি থাকে।

মুড়িতে ইউরিয়া না থাকলে মঙ্গল, তবে থাকলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। কে জানে, মুড়ির মধ্যের ইউরিয়ার ভূতের গল্পটা বিস্কুট ব্যবসায়ীদের সুপরিকল্পিত প্রচার কি না!

বিস্কুট ভাল খাবার, না খারাপ খাবার, এই প্রশ্নটা আপেক্ষিক। কিসের থেকে ভাল আর কিসের থেকে খারাপ এই কথাটা বুঝতে হবে। যদি রাস্তার মোড়ের কাটা ফলের সঙ্গে তুলনা করেন, পেটের রোগের সম্ভাব্য সংক্রমণের ক্ষতির দিক দিয়ে বিস্কুট অবশ্যই নিরাপদ। যদি প্রতিদিনের ঘরোয়া খাবার জন্যে ডাল, রুটি, সবজি, চিঁড়ে, মুড়ি আর ছাতুর সঙ্গে তুলনা করেন বিস্কুট একটি নিকৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর খাবার এই কারণে: ১) বিস্কুট একটি অত্যন্ত শক্তিঘন (ক্যালরি ডেন্স) খাদ্য। সব থেকে কম ক্যালোরির বিস্কুট হিসাবে খ্যাত দুটি মারি বিস্কুটে ৫৬ ক্যালোরি থাকে যেটা খরচ করার জন্যে প্রায় তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে। যাঁরা বাড়তি মেদ ঝরানোর জন্য চেষ্টা করছেন, বিস্কুট তাঁদের সেই প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দেবে। হাল্কাফুল্কা দুটো মারি বিস্কুটেই যদি এত ক্যালোরি থাকে তাহলে সহজেই কল্পনা করা যাবে ক্রিম বিস্কুট, বাটার বাইট বিস্কুট, মাখনে ভরপুর গুড ডে জাতীয় বিস্কুটে কত পরিমাণে ক্যালরি চট করে পেটে ঢুকে যাবে। ২) বিস্কুটে ফাইবার নেই বললেই চলে। ফাইবার যুক্ত বিস্কুটে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম ফাইবার পাওয়া যাবে। ফাইবার খাবার ইচ্ছে হলে ফাইবার যুক্ত বিস্কুট না খেয়ে সবজি আর ফল খেতে হবে। ৩) ট্রান্স ফ্যাট– খোলা, লেবেল ছাড়া লোকাল বিস্কুট, যেগুলো রাস্তার ধারের চায়ের দোকানের বয়ামে শোভা পায় সেগুলো ট্রান্স ফ্যাট দিয়েই তৈরি; না হলে সেগুলো খোলা হাওয়ায় বিস্বাদ হয়ে যাবে। প্যাকেটজাত বিভিন্ন নামীদামী ব্র্যান্ডের বিস্কুটে অন্যরকম উল্লেখ থাকলেও ০.৫ শতাংশের কম মাত্রায় ট্রান্স ফ্যাট থাকলে সেই প্যাকেটের গায়ে 'শূন্য ট্রান্স ফ্যাটের' তকমা আঁটা যাবে।

সহজলভ্য সময় অসময়ের খাবার হিসাবে বিস্কুট খাবার কথা ভাবছেন? আর কিছু হাতের কাছে নেই তো বিস্কুট খাবেন? হাতের কাছে আমরা কী খাবার রাখব, সেটা একটা অভ্যাসের ফল। অভ্যাস বদল করতে কতক্ষণ! কৌটোয় চিঁড়ে মুড়ি ছাতু আর ফ্রিজে ফল রাখাও যায়। রাস্তাঘাটে যখন কেবল এগ রোল বা শিঙাড়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া

কয়েকটি প্রচলিত প্যাকেটজাত কেক/বিস্কুটের উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

	কার্বোহাইড্রেট	চিনি	মোট ফ্যাট	সম্পৃক্ত ফ্যাট	ট্রান্স ফ্যাট	কোলেস্টেরল	মোট শক্তি
ব্রিটানিয়া কেক	৪৮	২৬	১৮	৯	০	৩৩	৩৭৮
গুড ডে	৬৭	২২	২২	১১	০	৭	৪৯৪
অরেঞ্জ বিস্কুট	৭৬	৩৯	১৫	৭	১	-	৪৬২
জিঞ্জার হারবাল বিস্কুট	৬৩.৪৩	১৯.৪১	২০.২৫	১০.৩৫	০	০	৪৪২
হরলিক্স বিস্কুট	৭৭	২৪.৩	১৩	৬.৪	০	০	৪৪৭
জিঞ্জার বিস্কুট	৭১.৭	২৫.১১	১৩.১	৭.৭	০	০	৪২৪
মারি বিস্কুট	৬৭.২৫	১৮.৭৩	১৩.০১	৬.২	০	০	৪১৩.১৭
নোনতা বিস্কুট	৬৬	৮	১৯	৯	০	০	৪৬৯
গড়পড়তা	৬৭	২৩	১৭	৮	০	১১	৪৪১

যাচ্ছে না, তখন অবশ্য বিস্কুট একটি নিরাপদ আপোস। রাস্তাঘাটে চটজলদি খাবার হিসাবে বিস্কুট তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপদ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে ঢের ভাল লাল আটার রুটি, চিঁড়ে, মুড়ি আর ছাতু। সেই মুড়িতে ইউরিয়া না থাকলে মঙ্গল, তবে থাকলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। কে জানে, মুড়ির মধ্যের ইউরিয়ার ভূতের গল্পটা বিস্কুট ব্যবসায়ীদের সুপরিকল্পিত প্রচার কি না! পোষ মানতে না চাওয়া জিভের আকৃতিকে লাগাম পরানোর জন্য আইনের অভাব নেই, অভাব আছে সেটার প্রয়োগে। প্যাকেটজাত খাবারের উপাদান ছাপানোর কঠোর নির্দেশ থাকলেও, অভিজাত বেকারির দোকানে প্যাকেটবিহীন বিস্কুট, কুকিজ, কেক আর অন্যান্য খাবারের মধ্যে কতটা রিফাইন্ড ময়দা, চিনি, ক্যালরি, সম্পৃক্ত ফ্যাট আর ট্রান্স ফ্যাট আছে সেটা উহ্য থেকে যায়। গোপনে বাড়তে থাকে স্থূলতা, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ। যখন প্রকাশ পায় তখন বড় দেরি হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র:

১. Journal of the brewing society of Japan, vol 83 (1988), No 2, p 136-141

২. https://en.wikipedia.org/wiki/Rancidification

৩. http://www.mayoclinic.org/trans-fat/art-20046114

৪. Trans fat content in labeled and unlabelled Indian bakery products including fried snacks, Reshma et al. International Food Research Journal 19(4): 1609-1614 (2012)

৫. উৎস মানুষ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ (৩৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯)

৬.https://law.resource.org/pub/in/bis/S06/is.1011.2002.pdf

৭. https://archive.org/stream/gov.in.is.1011.2002/is.1011.2002_djvu.txt

৮. উৎস মানুষ এপ্রিল-জুন ২০১৪ (৩৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২১)

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বরঃ** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

অসুস্থ সন্তান ও আমাদের নরক সমাজ

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

ভদ্রলোকের নাম মনিরুল। মনিরুল না হয়ে ইকবালও হতে পারত। এঁদের কী নাম, তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। খিদিরপুরে কোথাও একটা থাকেন। ঠিক কোথায় থাকেন তাতেও কিছু যায় আসে না। এ তো আর রাজভবন বা রাইটার্স বিল্ডিং নয় যে ঠিক ঠিক জানতে হবে। মনিরুলরা থাকেন। একটা পেশা আছে। নড়বড়ে, অস্থায়ী। সেলাই করেন নানান রকমের নকশা ধরে। প্রধানত মেয়েদের ব্যাগে বা বটুয়াতে। কাজ করেন যত্ন নিয়ে। ছাপ থাকে।

এহেন মনিরুলের আবার গল্প কিসের! সেটা নিয়েই এই ছোট্ট গল্প লেখা।

মনিরুলকে সন্ধের পরে পাওয়া যায়। এইভাবেই তিনি পরিচিত। কেনাবেচার কথা তখনই হয়। কালেভদ্রে কোনো দরদী মন ভাসতে ভাসতে কূলে ঠেকে গেলে দু-চার ছত্র কথা হয়। কেনাকাটার বাইরে। কথা হয় জীবন নিয়ে। নাকি জীবনের এক অখণ্ড বিভীষিকা নিয়ে! শোনার আগে কোনো আন্দাজ করা যায় না, এই নামগোত্রহীন মানুষটি কিসের সাথে যুদ্ধ করে আমার আপনার মতো বেঁচেও আছেন। হাল ছাড়েন নি। আত্মহত্যা করেন নি। গায়ে আগুন দিয়ে জ্বালা জুড়োন নি।

মনিরুলের একটি সন্তান। আগে মনিরুল স্কুলে পড়াতেন। ছেড়ে দিয়েছেন। ভঙ্গুর ছেলের জীবন জোড়া লাগাতে লাগাতে আর পেরে ওঠেন নি অন্য কারোকে ভাল করে গড়ে তোলার কাজে মন দিতে। অথচ আজও প্রত্যেকটি ইংরেজি কথার সুস্পষ্ট উচ্চারণ। ছেলের রোগের আধুনিক আলাপ-আলোচনা জোরের সঙ্গে করতে পারেন। চেনা যায় না তখন ওই ছুঁচের কারিগরকে। মনে হয় যথেষ্ট শিক্ষিত একজন আধুনিক মানুষের সঙ্গে কথা বলছি।

কী অসুখ ছেলের? ইংরেজি নাম ডাউন'স সিনড্রোম। মোঙ্গলিজমও বলে। এক ধরনের জন্মগত ত্রুটি, জিনঘটিত। পাঠক ইচ্ছেমতো বাংলা করে নিতে পারেন। তবে কেবল ডাউন'স সিনড্রোম নয়। ডাউন'স সিনড্রোমের খুব কঠিনতম অবস্থা। মনিরুল গড়গড় করে ডাক্তারি শব্দের সঠিক ব্যবহার করে রোগের বিবরণ সহজ করে দিতে পারেন।

মনিরুলবাবুর ছেলে ১৮ বছর বয়সে মারা যাবে। এখন বয়স বারো। ছেলের বুদ্ধি এক বছরের মতো। পায়খানা, পেচ্ছাপ পেলে আগে বলার ক্ষমতা নেই। নড়াচড়ায় বিশেষত অক্ষম। শুইয়ে দিতে হয়। পরিয়ে দিতে হয়। সারাদিন বাবা-মা চরম ধৈর্যের সাথে এ কাজগুলি করে চলেছেন বারো বছর ধরে। আর কেউ নেই করার। খুব কম সময় পাওয়া যায় অন্য কাজ করার, যাতে রোজগার চলতে পারে। আরো ছ বছর পরে আর করতে হবে না।

এই বেঁচে থাকাটা কেমন, তা লিখে জানানো যায় না, দেখে বোঝা যায় না। একমাত্র এইভাবে কষ্ট করলেই এই জীবনটার একটা কোনো উপলব্ধি সম্ভব।

কোনো এক সময়, আশায় বুক বেঁধে, অসুস্থ ছেলেকে বুকে করে নিয়ে গিয়েছিলেন মনের চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত এক কেন্দ্রে। অনেক ভরসায়। তাঁরা বললেন, ওঁদের ছেলে যে অসুস্থ, তা বুঝতে বোর্ড বসাতে হবে। বোর্ড বসাতে তিন হাজার টাকা লাগবে। এটাই নিয়ম। চুলোয় যাক যত সব এ ধরনের নিয়ম। যাঁরা নিয়ম করেছেন, হত তাঁদের ঘরের শিশুর এমন রোগ, বুঝতাম তখন কলমের ডগা দিয়ে কেমন এই অমানবিক নিয়ম বেরোত। নিয়ম কেন হয়। সমাজের ভালোর জন্য নিয়ম হয়। যে কোনও মূল্যে সে নিয়ম পালন করতে হবে, সমাজের যা হয় হোক। আজ একবিংশ শতকের গোড়াতেও তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা নিয়ম খাটিয়ে সেবা দেখাচ্ছেন। কী করে হবে এই অমানবিকতার বিচার! এই শূন্যে দোদুল্যমান সমাজের আত্মোপলব্ধি। ভাবার সময় নেই। টি-২০ চলছে।

অন্যদিকে একমাত্র সন্তান, অসুস্থ সন্তান। যার মৃত্যুর পরোয়ানা সর্বক্ষণ জানান দেয় অনিবার্য অন্তলীলার। কেমন করে দিন কাটে এঁদের? সমব্যথী হবার স্পর্ধা দেখাতে পারি? এক নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ অমঙ্গলের মাঝে ক্লান্তিহীন দিন গুজরান। হঠাৎ মৃত্যু নয়। আজ তার বয়স ১২। বুদ্ধি তার এক বছরে আটকে আছে। বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট। কিন্তু এই বালকের মৃত্যুর আগে সেই সাফল্যের সুযোগ পিতা-মাতা পাবেন না বা তাঁদের অসহায় সন্তান পাবে না। মৃত সন্তানের দুঃখ ভোলা এক কথা, আর জীবিত মৃত সন্তানকে বুকে করে পায়ে পায়ে হাঁটার কষ্ট বোঝার

ক্ষমতাও আমাদের সমাজে হয় নি। অবাক লাগে অমানবিকতার বহর দেখে। উদাসীনতার সীমানা দেখে। আমি অযথা হাহাকার করছি না। খুব অল্প হলেও, বিদেশে কোথাও কোথাও মেঘ সরেছে। এই ধরনের অসুস্থ সন্তানদের জন্য বাড়তি দেখাশোনার ব্যবস্থা আছে। আছে সচেতন যত্ন।

কিন্তু তবু মনিরুলের স্ত্রী আর মনিরুল রাত বারোটার পর ঘণ্টাদুয়েক নিজেদের জন্য সময় করে নেন। সেলাই করেন, সেলাই করে বোধ হয় নিজেদের অস্তিত্বের মানে খুঁজে বেড়ান। সন্তান তখন ঘুমন্ত।

লেখাটা এখানেই শেষ হতে পারত। পারল না। পারলে তিন হাজার টাকা চাওয়া মনোদরদীদের সাথে এক সারিতে খাওয়া যেত। গেল না। নরক সমাজেও ত ওঠানামা আছে। রাতও ভোরের অপেক্ষায় থাকে, তা যতই দেরি হোক।

বর্তমান অবস্থাটি কী? বাড়তি সহযোগিতা দূরস্থান, কোথাও এইরকম অসুস্থকে নিয়ে গেলে লোকে অস্পৃশ্যের মতো তাচ্ছিল্য করে। নাকে কাপড় দেয়। অসুস্থ মানুষটি বোঝেও না। ভাগ্যিস বোঝে না, বুঝলে হয়ত জ্বলেই উঠত।

সামান্য একটা পা ফেলা যদি যায়। এহেন রোগীদের জন্য একটু বাড়তি জায়গা করে দেওয়া, একটু ভরসা দেওয়া, অন্তর থেকে ভালবেসে, দায়িত্ব বোধে। এই আশাতেই লেখা।

না! এখানেও শেষ করা গেল না। মনিরুলবাবুকে সব লেখাটা শোনাতে তিনি বললেন যে কথা কটা এখনও শেষ হয় নি। শেষটা লিখতে গেলে আপনাকে আমাদের বাড়ি যেতে হবে। আসল যোদ্ধা সেখানেই বসে আছেন। আমার স্ত্রী।

উমা

শিক্ষার অধিকারের গুঁতো ধরাশায়ী বেচারা ছাত্রছাত্রীরা

সুদেষ্ণা ঘোষ

আধুনিক যুগের ছানা ফেল করানো মানা
নম্বর কম পেলেই ভাবি
'ফেল হবে? না না না না!'
সদাই মরি ত্রাসে, পাছে ফেল করে কেউ বসে
চোখ বুজে তাই নম্বর বাড়াই
উত্তরে কি যায় আসে!
ঘুম নাহি মোর চোখে যদি 'ভুল' করে কেউ টোকে
আবার খাতা দেখতে হবে?
ক্ষমা করে দিই ওকে!
সোয়াস্তি নেই মনে মরেছি টিচার বনে
উপরওয়ালার মন রাখতে
ফেলি আদর্শ এক কোণে।
টিচার হওয়ার পেশা, পড়ানো এই নেশা
ফাঁসিকাঠে ঝোলার সমান
এমনি মোদের দশা!

সুকুমার রায়কে নমস্কার জানিয়ে এবং তাঁর লেখা অবলম্বনে এই কটি পঙ্‌ক্তি লেখার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এই লেখা শুরু করছি। আমার উপায় ছিল না। শিক্ষিকা হবার দরুন কবিতার মাধ্যমে মনের করুণ অবস্থা ব্যক্ত করতে হবে, এমনটা ভাবি নি। তবে আমার কথা ওই কবিতাতেই সীমিত রেখে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত বাকিদের কথা বলতেই এই লেখা। 'বাকি' বলতে এখানে ছাত্রছাত্রী। পাঠক হয়ত অবাক হচ্ছেন। যাদের জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা, যারা এই মহা কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র, মধ্যমণি, তাদের একজন সামান্য শিক্ষিকা কোন সাহসে 'বাকি' বলে সম্বোধন করেন? তাহলে খুলেই বলি, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে যাদের শিক্ষিত হবার জন্য সবকিছুর আয়োজন, সবশেষে তাদেরই কোনো উপকার হচ্ছে না। তাই তারা 'বাকি' পড়ে থাকছে বলে আমি মনে করি।

বিশাল প্রাসাদের মতো শিক্ষার পরিকাঠামো। একজন সাধারণ শিক্ষিকা এই অট্টালিকার সামনে পিঁপড়ের মতো ছোট; তবে পিঁপড়েরাই অট্টালিকার ফাঁকফোঁকর ঠাহর করতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার হাতি, গণ্ডার, জলহস্তীদের চোখে এই ক্ষুদ্র ছিদ্র ধরা পড়া প্রায় অসম্ভব এবং দেখতে পেলেও সেগুলি অতি সামান্য বলে মনে হয়।

১৮ বছর শিক্ষকতা করার সুবাদে এবং পিঁপড়ে হয়ে থাকতে পারার সুবাদে

বেশ কিছু 'ফাঁকফোঁকরের' সন্ধান পেয়েছি, যা কিনা লক্ষ্ণৌয়ের ভুলভুলাইয়াকেও হার মানায়! এবারে একটা গল্প বলি। একটা ছোট মেয়ের কথা। সে একদিন বাবা-মায়ের হাত ধরে একটি নামী স্কুলে ভর্তি হতে এল। বাবা বড় ব্যবসাদার, মা ডাক্তার। ভর্তি হয়ে গেল সহজেই। বড় হতে লাগল সে মেয়েটি। এক এক করে ক্লাসের গণ্ডি পেরোচ্ছিল। বেগ পেতে হল ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে সেই অঙ্ক! যুগ যুগ ধরে ছাত্রছাত্রীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে আসছে। (আমিও বাদ ছিলাম না।) আমাদের এই ছাত্রীটি বেশ খারাপ করল। রিটেস্টেও তাই। বাবা-মায়ের ডাক পড়ল। ব্যস্ত জীবনের মধ্যে কোনোরকম সময় বার করে কথা বললেন ক্লাস টিচারের সঙ্গে। ফেল করানোর নিয়ম নেই। রিটেস্ট-এর ফল খারাপ হলেও নেই। আধুনিক যুগের নতুন নিয়ম মাফিক বাবা মা একটি কাগজে সই করলেন আন্ডারটেকিং, যার সোজা মানে তাঁরা দায়িত্ব নিচ্ছেন যাতে মেয়ে পরের বারে ভাল করে। ছাত্রীটি সপ্তম শ্রেণীতে উঠল। ষান্মাসিক পরীক্ষা হল, তাতে অঙ্কে আবার খারাপ হল। রিটেস্ট। স্কুলে রেমিডিয়াল ক্লাস, বাড়িতে টিউশনি, সবই একসাথে চলল। এত চাপে ওর মনের ওপর চাপ বাড়ল; অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অঙ্ক ছাড়া বিজ্ঞানেও খারাপ করল। আবার রিটেস্ট হল। দুটো বিষয়তেই। সেখানেও ফল ভাল হল না। স্কুল কর্তৃপক্ষ বাবা-মাকে ডেকে বোঝালেন যে, হয়ত ওর মানসিক বিকাশ ধীর গতিতে হচ্ছে, সপ্তম শ্রেণীতে রেখে দিলে ভাল হবে। বাবা-মা শিক্ষিত, সচেতন এবং নাছোড়বান্দা। শিক্ষিকারা কী করছিলেন ...? বোর্ডে অষ্টম শ্রেণী অবধি ফেল করানোর নিয়ম নেই, তাঁরা কোর্টে যাবেন ইত্যাদি। অগত্যা সেই ছাত্রীটিকে নম্বর 'ভর্তুকি' দিয়ে তুলে দেওয়া হল অষ্টম শ্রেণীতে। আন্ডারটেকিং সই করিয়ে নিয়ে। সে তখন প্রায় কিছুই বোঝে না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে শিক্ষিকার দিকে। প্রশ্ন করলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, উত্তর দিতে পারে না। দিনের পর দিন এভাবে কেটে যায়। তার মনের ওপর চাপ বাড়ে। আবার আগের পর্ব টিভি সিরিয়ালের মতো 'রিপিট টেলিকাস্ট' হয়। নবম শ্রেণী। ছাত্রী ফেল করে। রিটেস্ট। দ্বিতীয় রিটেস্ট। '...নবম শ্রেণীতে ফেল করানো যায়, কিন্তু বেশি ছাত্রছাত্রী ফেল করলে স্কুলের বদনাম হবে। তুলে দাও, নম্বর বাড়িয়ে দাও...'। আবার সই আন্ডারটেকিংয়ে। পাঠক বুঝতেই পারছেন যে, ওই কাগজের সত্যি কোনো মানে নেই। ছেলেভোলানো গল্প মাত্র! না বলা, না লেখা নিয়মে সে উঠে গেল দশমে। এখানেও বেশি করে নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হল তাকে। সে জানল না সে কোন বিষয়ে ভাল। কোনও বিষয়ের প্রতি ভালবাসাও জন্মাল না তার।

মা ডাক্তার। অবশ্যই মেয়ে বিজ্ঞান পড়বে। অঙ্ক ছাড়াই নেবে। আজকাল ছাত্রছাত্রী যা পড়তে চায়, তাই দেওয়ার চেষ্টা হয়। যেহেতু ঠেলে পাস করানো হয়, নম্বর বাড়িয়ে পাস করানো হয়, সেই ছাত্রী নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে না। একাদশ শ্রেণীতে কোনোরকমে পাস করে দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠে বোর্ডের পরীক্ষায় বসল। বিশেষ কিছুই না শিখে, না জেনে কোনোক্রমে পাস করে গেল সে। বোর্ডের পরীক্ষাতেও ঢেলে নম্বর দেওয়ার চল আছে তো!

এটা একটা ছাত্র বা ছাত্রীর গল্প নয়। বহু ছাত্রছাত্রীর জীবনে এইভাবে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে। রাইট টু এডুকেশনের নামে। ১০০ শতাংশ লিটারেসি দেখানোর এই সুবর্ণ সুযোগ শিক্ষাব্যবস্থার হাতি, গণ্ডার, জলহস্তীরা ছাড়বেন কেন? শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই বিশাল কর্মকাণ্ডের দাবা খেলার ছকে বোড়ে। সোজা এগিয়ে যেতে হবে। পিছনোর পথ নেই।

এ ক্ষেত্রে দেশের এক প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ফলাফল সম্বন্ধে কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতার কথা না বললে ঢেলে নম্বর দেওয়ার প্রসঙ্গটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার পরিচিতা এক শিক্ষিকা (শ্লেষের সঙ্গে) আক্ষেপ করেছিলেন, 'দ্বাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষায় ঢেলে নম্বর দিয়েও কিছু করা যাচ্ছে না! প্রথম ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন ফেল করেছে।' দশম শ্রেণীর খাতার ক্ষেত্রেও বিষয় নির্বিশেষে একই আক্ষেপ। কোথাও কোথাও ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নাবলী বারবার টুকে পাতা ভরে দিয়েছে। এত কম জেনে তারা কেমন করে দশম বা দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠেছে? এর দায় কার? ছাত্রছাত্রীদের? শিক্ষক-শিক্ষিকার? নাকি শিক্ষাব্যবস্থা যাঁরা ঠিক করেন সেই ওপরতলার মানুষদের?

এক এক করে দেখা যাক। ছাত্র ছাত্রী। আজকাল বেশিরভাগের জীবনে 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' কথাটি খাটে না। তপস্যা করার জন্য চাই শান্ত পরিবেশ, চাই মনের একাগ্রতা। আজকাল অ্যাকটিভিটি বেস্‌ড লার্নিং আর প্রজেক্ট-এর কল্যাণে স্কুল আধুনিক শপিং মলে পরিণত হয়েছে। সর্বদা সাজ সাজ রব, স্কুলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের অ্যাকটিভিটি হয়ে চলেছে– আঁকা, খেলা, ডিবেট, কুইজ, কারনিভাল, অ্যাসম্বেলি, সারাদিন চারিদিকে গুঞ্জন, ভিড় লেগেই আছে। এ হেন পরিস্থিতিতে তপস্যা সত্যিই সমস্যা। বাড়িতেও বিস্তর কাজ– মোবাইলে কথা বলা, টিভি দেখা, কম্পিউটারে ফেসবুকে স্ট্যাটাস আপডেট করা, ছবি তোলা, ছবি শেয়ার করা, পার্টি, বিয়েবাড়ি, সিসিডি,

মাল্টিপ্লেক্স ইত্যাদি। এত কাজের মধ্যে কখন পড়াশোনা হবে! তাছাড়া শিক্ষা অর্জনের জন্য কজনই বা পড়ে? শুধু পাস করা দরকার এবং সেটা তো শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে আপনাআপনি হচ্ছে, তাই পড়ার দায়দায়িত্ব থেকে ছাত্রছাত্রীদের এই বয়সেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

আসি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথায়। এই গোষ্ঠীকে একটি নাম দিতে বললে আমি 'নন্দ ঘোষ' বলে ডাকব। খুব সোজা হিসেব। সব দোষ এঁদেরই। (আমি অবশ্যই এঁদের মধ্যে সেই সব শিক্ষিকার কথা আনছি না, যাঁরা স্কুলে গিয়ে পড়ানোর চেয়ে শাড়ি-গয়না নিয়ে, কিংবা সিনেমা-সিরিয়াল নিয়ে গভীর আলোচনা বা নিখাদ পরচর্চা করতে ভালবাসেন, বেশি মনোযোগ দেন। ধরছি না সেই শিক্ষকদের, যাঁদের রাজনৈতিক যোগের সূত্রে রোজ স্কুলে না গেলেও চলে, গেলেও রাজনীতি বা খেলাধুলোর আলোচনায় যাঁদের আগ্রহ বেশি।) আরো স্পষ্টভাবে বলি, সব দায়দায়িত্ব এঁরাই নেন, এঁরাই বন্দুকের নলের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকেন; তাই এঁদের দোষারোপ করা সহজ এবং স্বাভাবিক। এঁদের অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে আলফ্রেড টেনিসন-এর দ্য চার্জ অভ দ্য লাইট ব্রিগেড-এর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে গেল, 'Theirs not to make reply/Theirs not to reason why/Theirs but to do and die...'। শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেকেই শিক্ষার অলো বিতরণ করার জন্য জীবন দিয়ে চলেছেন, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার, উত্তর জানতে চাওয়ার অথবা বর্তমান অব্যবস্থার থুড়ি অবস্থার কোনো কারণ খোঁজার অধিকার এঁদের নেই।

এবার যাই অন্যপ্রান্তে। শিক্ষাব্যবস্থার ওপরতলায়। সেখানে যাঁরা আছেন তাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত। তাই মোটা মোটা ডকুমেন্ট তৈরি করেছেন, যেমন ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, রাইট টু এডুকেশন ইত্যাদি, যেখানে অনেক দেশের মনীষীদের বক্তব্য লেখা। ওঁরা বাতানুকূল ঘরে বসে ভাবেন, লেখেন... ভাবনাগুলি আকাশছোঁয়া, এর প্রয়োগ সম্ভব কিনা ভেবে দেখেন না। কেমন করেই বা দেখবেন! তার জন্য যে মাটিতে পা ফেলে হাঁটতে হবে এবং এঁরা সেই মাটি থেকে অনেক উঁচুতে বিচরণ করেন। এবং ওঁদের অসম্ভব চিন্তাধারাকে সম্ভব করতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা হিমশিম খান।

রাইট টু এডুকেশন। এই উপরতলার কিছু মানুষদের স্বপ্ন বিশালাকার প্রাসাদতম শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে উঁচু এবং ঝলমলে পতাকা। কিছুদিন আগে দ্য টাইমস অভ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত 'Modi's Middle Class Muddle' প্রতিবেদনে সত্যানন্দ ধুমে, যিনি ওয়াশিংটন ডিসি-র আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের রেসিডেন্ট ফেলো, লিখেছেন, এনজিও 'প্রথম'-এর অ্যানুয়াল স্টেটস অভ এডুকেশন রিপোর্ট অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণীর গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডাব্‌ল ডিজিট সাবস্ট্রাকশন করতে পারে এমন পড়ুয়াদের সংখ্যা ২০১০-এ ৫৮% থেকে কমে ২০১৪-তে ৪০% হয়েছে এবং চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী, যারা প্রথম শ্রেণীর বই পড়তে পারে তাদের হার ২০১০-এ ৬৮% থেকে কমে ১৪-তে ৫৬% হয়েছে। ইউনিভার্সিটি অভ লন্ডনের প্রফেসর গীতা কিংডনের বক্তব্য– রাইট টু এডুকেশন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে পিছিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'By outlawing detention of students before eighth grade, the law effectively delinks advancement from educational achievement.'

অথচ এই রাইটের জোরেই অনেক ছাত্রছাত্রী যাদের কিনা ফেল করে একটা বছর একই শ্রেণীতে পড়লে ভাল হত, পরপর কৃত্রিমভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। নাকি পিছিয়ে...!

পিঁপড়ের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। ফেল করা বা করানো (কারণ এখন ভাবা হয় ছাত্রছাত্রী ফেল করে না, করানো হয়) কি খারাপ? তাহলে ইংরাজি প্রবাদ 'ফেলিওরস আর দ্য পিলার্স অভ সাকসেস' কি ভুল প্রমাণিত হয়েছে? বাবার কাছে শুনেছি ওঁদের সময়ে পরীক্ষার ফল বেরোলে পাড়ার মানুষ খুব সহজে জিজ্ঞাসা করতেন, 'এবারে পেরেছ, না পারো নি'? যেন পারা, না-পারা দুটোই সমানভাবে সম্ভব। সে সময়ে না-পারার গ্লানি ছিল কিন্তু সেই গ্লানি কাটিয়ে উঠে ছাত্র বা ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে পরের বছরে উঠে পড়ে লাগত; গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার দড়ি আর সুইসাইড নোট লাগত না। আমরা 'না-পারা'-কে 'পারা'-তে পরিণত করার জন্য নম্বর বাড়িয়ে পাস করিয়ে ছাত্রছাত্রীর প্রতি সদয় হচ্ছি, নাকি তাকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছি? দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এতগুলি জীবন জেনেশুনে নষ্ট করা কি দেশদ্রোহিতা নয়?

আমার এই লেখার দৌলতে শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টে যাবে এমন আশা করি না। আমি জানি আর যেসব 'মহাজনে' এই মহোৎসব শিক্ষার নামে চালু করেছেন, তাঁরা জানেন না, তা হতে পারে না। তাঁদের কিছু যায় আসে না। আর আমার দুশ্চিন্তা এখানেই।

Reference: Dhume Sadanand, Modi's Middle Class Muddle, The Times of India, April 23, 2016

উমা

গ্রাম্য চিকিৎসকের আত্মকথন

সাধন বিশ্বাস

চিকিৎসা অনেক দিনই সমাজসেবা থেকে লাভজনক পেশা বা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এখন এই পেশায় আসতে গেলে মেধা লাগত, এখন বাবার টাকা থাকলেই চলে। ব্যবসার মূল নীতি বিনিয়োগ করা এবং তা সুদে-আসলে উসুল করা। চিকিৎসকেরাও তাই করেন। গ্রামের হাভাতেদের চিকিৎসা করলে আর যাই হোক ব্যবসা লাটে উঠবে। দু-চারজন ব্যতিক্রমী বাদ দিলে ডাক্তাররা কেউই গ্রামের ধারেকাছে ঘেঁষেন না। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি আছে। সেগুলো অবস্থানগত এবং চিকিৎসা পরিষেবা- দু দিক থেকেই নাগালের বাইরে থাকে। অগত্যা অগতির গতি গ্রাম্য চিকিৎসকেরাই। শহুরে লোকজন যাঁদের একটু অবজ্ঞার সুরে হাতুড়ে বা কোয়াক বলে থাকেন। এঁরা কিন্তু এঁদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী গ্রামের মানুষের মাঝে থেকেই সাহায্য করার চেষ্টা করেন। অনেক বিশেষজ্ঞই সাপের কামড়ের চিকিৎসায় স্থানীয় ওঝাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেন। গ্রাম্য চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও তেমন করার দাবি উঠছে অনেকদিন ধরে। সরকার গ্রামে চিকিৎসক পাঠাতে অক্ষম, আবার হাতুড়েদের তালিম দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো করে নেওয়ার সদিচ্ছাও দেখায় না। তবু ওঁরা কাজ করে চলেছেন। খুব বড় বা জটিল কোনো রোগ না হলে গ্রামের মানুষের ওঁরাই পরিত্রাতা। তেমনই এক চিকিৎসকের নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী এটি। **সঃ**

আমি একজন গ্রাম্য চিকিৎসক। শহুরে লোকজন যাদের হাতুড়ে বা কোয়াক ডাক্তার বলে থাকেন। ডিগ্রিহীন, স্বীকৃতিহীন হাতুড়েকে 'ডাক্তার' বা 'চিকিৎসক' হিসেবে পরিচয় দেওয়াটা কতখানি অপরাধের মধ্যে পড়ে তাও জানি না। কিন্তু ডাক্তার বা চিকিৎসকের সরকারি তকমাটুকু না থাকলেও আমি গ্রামে ডাক্তারি করি, এটাই বাস্তব। আমাদের বাংলার স্বাস্থ্য দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী আমার মতো ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। আমি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করি। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই দশ লক্ষের হিসাবটা শুধুমাত্র অ্যালোপ্যাথরা নাকি অন্যান্য প্যাথি জুড়ে এই সংখ্যা, তাও অজানা। অন্যান্য প্যাথি বলতে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, হেকিমি, ইউনানি, যোগ ইত্যাদির কথা বলছি। তবে জানি, মূলত অ্যালোপ্যাথির মাধ্যমেই বেশিরভাগ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে। পাশাপাশি কিছু হোমিও চিকিৎসক আছেন। আয়ুর্বেদ ইত্যাদির প্রচলন বিক্ষিপ্ত। তবে ধীরে ধীরে হোমিও চিকিৎসারও গুরুত্ব কমছে। জরুরি এবং জটিল রোগে দ্রুত সুস্থ হতে রোগীরা অ্যালোপ্যাথদের কাছেই যায়।

সরকারি ঘোষণা : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিভাগ ঘোষণা করেছে, আমার মতো পল্লী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শরীর-স্বাস্থ্য-রোগ-ব্যাধির বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ। এবং সেই ভিত্তিতে কিছু বিধিনিষেধ মেনে চিকিৎসা করার ছাড়পত্র মিলবে। এই মোতাবেক 'আশা' কর্মীদের কাছে বা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমাদের নাম নথিভুক্ত করবার ঘোষণা করা হয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে গ্রুপভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগ শুরু হয় নি এখনও। খবর নিয়ে জানা গেল, স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে, তাদের হিসাব মতো যত সংখ্যক কোয়াক আছে, তার মাত্র ১০ শতাংশ তালিকাভুক্ত হয়েছে। সেই কারণ দেখিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়েছে।

আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগ এই প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে দুটি কারণে। একটি হল, আমাদের সংগঠনের (পল্লী চিকিৎসক সংগঠন) দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং সবার জন্য অন্তত ন্যূনতম স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে, এই দাবি। সারা দেশের কথা ছেড়ে দিলাম, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো পরিকাঠামো স্বাস্থ্য দপ্তরের নেই। সেই ঘাটতি পূরণ করি আমরা। প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ আমাদের ওপর নির্ভরশীল। অনেক মফস্বল-শহরেও আমাদের মতো বহু ডাক্তার প্র্যাকটিস করেন। আমাদের মতো ডাক্তাররা দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। যাদের কোনো সরকারি স্বীকৃতি

নেই। তবু কখনও শুনি নি এইসব ডাক্তারদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ওঝা-গুণিনদের তেল-জলপড়া বা তাবিজ-কবচের বুজরুকিও রমরম করে চলত। একটু কমলেও এখনও উচ্ছেদ হয় নি সে সবের।

আমার শিক্ষালাভ: ছোটবেলা থেকেই আমি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। পাশাপাশি বালক বয়স থেকেই আমি ভীষণভাবে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক। যুক্তিবাদের এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বই পত্রপত্রিকা পড়েছি এবং পড়ি। আমি জানি, চিকিৎসাটাও একটা বিজ্ঞান। সঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাতেই রোগ সারা সম্ভব। আগডুম-বাগডুম চিকিৎসাতে রোগ বাড়ে বা রোগী মরে। তাই আমার যোগ্যতা অনুযায়ী যতটা সম্ভব বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা এবং রোগীকে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করি।

১৯৯৩-এ আমার এই পথে চলা শুরু। প্রথামাফিক তেমন কোনো প্রশিক্ষণ নেই বা কোনো ডিগ্রিধারী ডাক্তারবাবুর তত্ত্বাবধানে থেকেও শিক্ষালাভ করবার সুযোগ হয় নি। ভরসা শুধু পুঁথিপাঠের জ্ঞান আর শেখবার, জানবার অদম্য ইচ্ছা, যা আমি এই দীর্ঘ ২৩ বছরে ধীরে ধীরে 'দেখে শিখে' আর 'ঠেকে শিখে' অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

কোন কোন রোগী দেখি: যে সব 'কেস' আমার সাধ্যের বাইরে, সে সব বাদে আর সকল ধরনের রোগীর চিকিৎসা করবার চেষ্টা করতে হয়। জ্বর (কমন কোল্ড ফিভার), টাইফয়েড, চিকনগুনিয়া, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া (বিনাইন), সাধারণ পেটব্যথা, ডায়েরিয়া, আমাশয়, সাধারণ জন্ডিস, শরীরব্যথা, গাউট, মাথাযন্ত্রণা, দুর্বলতা, উচ্চ রক্তচাপ, হাই ব্লাড সুগার, ছোটখাটো সার্জারি (টিউমার, ফোঁড়া), স্টিচ দেওয়া, শরীরের কোথাও কাঁটা-পিন -পেরেক ঢুকে গেলে সে সব কেটেকুটে বের করা, স্যালাইন প্রয়োগ ইত্যাদি। রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক সময় রক্ত-মল-মূত্র-কফ পরীক্ষা করিয়ে তার রিপোর্ট অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হয়। ওষুধ দ্বারা গর্ভপাত (এমটিপি) করাই। ৪৯-৬৩ দিনের গর্ভপাত।

রেফার: যে সব কেস আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বা বুঝেও এই চিকিৎসা করা আমার অসাধ্য বা আয়ত্তের বাইরে, সে সব রোগীকে হাসপাতালে বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিই। যেমন, জেনারেল সার্জারি, গাইনো সার্জারি, হেপাটাইটিস, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, হার্ট অ্যাটাক, বিষ অথবা অ্যাসিড ইত্যাদি খাওয়া রোগী। অনেক সময় নিজেই রোগীকে বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাই।

রোগীদের থেকে টাকা: পল্লী চিকিৎসকদের প্রায় ১০০ শতাংশেরই আয় আসে রোগীদের কাছে ওষুধ বিক্রি করে। অর্থাৎ রোগীকে আমরাই ওষুধ দিয়ে দিই। নিতান্ত দরকারি ওষুধটি আমাদের কাছে মজুত না থাকলে লিখে দেওয়া হয়। ওষুধ থেকে যে কমিশন পাই, মূলত সেটাই আমাদের আয়। তাছাড়া ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি থেকেও একটা পারসেনটেজ পাওয়া যায়। এছাড়া সার্জেন ডাক্তারবাবুরাও প্রতি সার্জারিতে কমিশন দেন।

কী ধরনের ওষুধ প্রয়োগ: 'অফিস', জেনেরিক এবং স্যাম্পল (পি এস)– তিন ধরনের ওষুধই ব্যবহৃত হয়। যাঁরা ছোটখাটো ওষুধ সাপ্লাইয়ের কাজ করেন, তাঁদের থেকেই পেয়ে যাই পি এস ওষুধ। অন্য দু ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় প্রায় নকল ওষুধের দোকানে। ভাল কোম্পানির জেনেরিক ওষুধে ভাল কাজ পাওয়া যায়। দামেও খুব সস্তা হয় (৫০% - ৯০%)। রোগীকেও আমরা বেশ ভাল কমিশন দিই সে সব ওষুধে (৩০% -৬০%)। এখন তো এই ওষুধ বহু হাসপাতালে বিক্রি হচ্ছে (৬৬.৫% ছাড়)। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে।

নামী কী কী দিই না: কৌটোর দুধ, গ্রাইপ ওয়াটার, অ্যান্টিব্যাক্ট্রিন অয়েল, যৌন উত্তেজক ওষুধ (জাপানি অয়েল, বড়ি-ক্যাপসুল, রকেট তেল, বড়ি-ক্যাপসুল)। আমার ধারণা, এইসব ওষুধ অবৈজ্ঞানিক, ক্ষতিকর এবং লোকঠকানো কারবারের ফাঁদ। তবে ইরেক্টাইল ডিজঅর্ডার বড়ি রাখি, কেউ চেয়ে নিলে দিই। আর আমি জানি এনজাইম সিরাপ ইত্যাদি মেডিকেল সায়েন্সের মধ্যে পড়ে না। যেমন পড়ে না ভিটামিন টনিক (অধিকাংশই গুড়গোলা জল); কিন্তু বাধ্য হয়ে রাখতে হয়। কারণ সত্যবাক্য রোগী বুঝতে চায় না। টনিকে তারা অনেকটা মানসিক জোর পেয়ে শারীরিক সবলতা ফিরে পায়। না দিলে অন্যত্র চলে যাবে (আমার রুটি-রুজিতে সংকট দেখা দেবে)। যেমন বাধ্য হয়ে দিতে হয় ক্ষুধাবর্ধক ওষুধ (অ্যালোপ্যাথ, আয়ুর্বেদ), লিভার টনিক।

রোগীকে কিংবা সাধারণ মানুষকে আমার পরামর্শ: এ কথা একশো ভাগ সত্যি যে, একজন চিকিৎসক, একজন স্বাস্থ্যকর্মী শুধুমাত্র রোগীকে ওষুধ দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সঠিক রোগনির্ণয় করে সঠিক ওষুধ ব্যবহারে হয়ত সত্যিকার শারীরিক সমস্যার উপশম হয়, কিন্তু আগামীতে সেই রোগী যাতে অসচেতনতার ফলে (নিজে থেকে তৈরি করা রোগ) আবার রোগাক্রান্ত না হয়, তার সঠিক সুপরামর্শ দেওয়াটা একান্ত কাম্য। বাচ্চা জন্মাবার এক ঘণ্টার মধ্যে স্তনদুগ্ধ পান করানো এবং বাচ্চার ৬ মাস বয়স অবধি শুধুমাত্র বুকের দুধই পান করাতে হবে; এর মধ্যে এক ফোঁটা জলও

বাচ্চার পক্ষে বিষের সমান। এই সঠিক উপদেশটি আমি প্রতিটি প্রসূতি মাকে বা পরিবারকে অণুক্ষণ বলে থাকি। শিশুর বয়স ৬ মাস পেরিয়ে গেলে বুকের দুধের সঙ্গে অন্যান্য পুষ্টিকর সুষম খাবার (চাল ডাল শাকসবজি সহকারে খিচুড়ি, ডিম, মাছ ইত্যাদি), পরিস্রুত জল, নরম ফল খাওয়াতে হবে। বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোনো দুধ (কৌটোর, পশুর) কোনোদিন না খাওয়ার কথা বলে থাকি সবাইকে, সে বাচ্চা হোক বা বড়। আমার মনে হয়েছে, কৌটোর দুধের সঙ্গে নর্দমার জলের কোনো প্রভেদ নেই। আর মানুষের জন্য পশুর দুধ অনুপযুক্ত। এই দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবারদাবার মারাত্মক ক্ষতিকর।

এ ছাড়াও যেসব পরামর্শ দিয়ে সচেতন করার চেষ্টা করি তা হল– নিয়মিত উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ এবং ডায়াবেটিসের ওষুধ খাওয়ার। অতিরিক্ত নুন, তেল ঘি চর্বি না খাওয়ার। গর্ভ প্রতিরোধে কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেতে এবং তার গুণাগুণ বর্ণনা। চোলাই, ধূমপানের মতো নানান মাদক দ্রব্য আমাদের কী কী ক্ষতি করে এবং তা বর্জনের উপদেশ। এই সমস্ত ব্যাপার, যা কিছু অবৈজ্ঞানিক, যা কিছু ক্ষতিকর, সকল বিষয়ে আমার সাধ্যমতো পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েই যাই নিরন্তর।

সংগঠনঃ 'মেডিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অভ বনগাঁ মহকুমা' সংগঠনের সঙ্গে আমি যুক্ত। শুধু সাধারণ সদস্য নই; বেশ খানিকটা দায়িত্ব গ্রহণ করি এই সংগঠনের। তিনটি ধাপে আমাদের এই সংগঠন বিস্তার লাভ করেছে। মহকুমা স্তরের কমিটি, জেলা কমিটি এবং রাজ্য কমিটি। প্রতিটি স্তরের সঙ্গে আমাদের সর্বদা সমন্বয় থাকে। একত্রে এই তিন ধাপের কমিটির নাম 'পল্লী চিকিৎসক সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটি'। এই একত্রিত সংগঠনের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি প্রশিক্ষণ আর স্বীকৃতির। বনগাঁ মহকুমার সংগঠনের জন্ম ২০০২ সালে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ছিল ১২০ জন। কিন্তু বর্তমানে সদস্যসংখ্যা প্রায় ৪৫০ জন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণের ঘোষণা পাওয়ার পরই হঠাৎ করে এই বাড়তি পল্লী চিকিৎসকেরা সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশাসনের কাছে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে দাবি আছে, আমরা যাঁরা সংগঠন করেছি, দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করেছি, তাঁদের (সংগঠন অন্তর্ভুক্ত ডাক্তারদের) প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই বার্তা পেয়েই বাড়তি গ্রাম্য চিকিৎসক বন্ধুরা সংগঠনে এসেছেন। আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন আন্দোলনে যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হলেন এস এস কে এম হাসপাতালের গ্যাসট্রোএনটেরোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী মহাশয়। তাছাড়া আরও অনেক বিদ্যৎজন, বুদ্ধিজীবী ছিলেন বা আছেন আমাদের সঙ্গে। যাঁরা আমাদের মতো ডাক্তারদের গুরুত্ব বোঝেন।

সংগঠনের অন্যান্য কর্মসূচি: এই সংগঠনের উদ্যোগে সরকারি ডাক্তারদের সহযোগিতায় 'ডটস'-এর প্রশিক্ষণ নিয়ে সংশাপত্র পেয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অভ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট বিভাগের ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে পরীক্ষায় পাস করে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট ইন মডিউলার এমপ্লয়েবল স্কিল-এর শংসাপত্র পেয়েছি। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভোকেশনাল কোর্স করে সার্টিফিকেট পেয়েছি। এই সবকিছুই হয়েছে সংগঠনের উদ্যোগে। বনগাঁ শহরের কিছু মেডিসিন বিভাগের, সার্জারি বিভাগের, গাইনো বিভাগের ডাক্তারবাবুরা আমাদের সংগঠনে উপদেষ্টা হিসাবে, পরামর্শদাতা হিসাবে আছেন। এঁরা মাঝে মাঝে আমাদের এক-একটি বিষয়ের ওপর ক্লাস করান, রোগ ও রোগী চিনতে সাহায্য করেন। আমরা অনেক অজানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। কখনও কখনও কলকাতা থেকে কিছু বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুও আসেন, আমাদের প্রশিক্ষণ দেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে গ্রাম্য চিকিৎসকদের খুব কম সংখ্যকই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আর একটা বিষয়ে আমরা বেশ খানিকটা জ্ঞান, পরামর্শ পেয়েছি অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট সম্বন্ধে। বেশ কয়েকবার আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সিপলা কোম্পানির হয়ে এই বিষয়ে কাজ করা ডাঃ অমিতাভ দে মহাশয়। তিনি বুঝিয়েছেন, নিয়মিত শ্বাসকষ্টের বড়ি/ক্যাপসুল/সিরাপ খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। তাঁর কাছ থেকে আমরা জেনেছি শ্বাসকষ্টের জন্যে ইনহেলার বা 'রোটাক্যাপ' ব্যবহার করলে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা খুব কম। কেন না এই ওষুধ সরাসরি ফুসফুসে গিয়ে কাজ করে। অন্য মাধ্যমের ওষুধে ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। যেমন বেশি মাত্রায় সলবেটল, স্টেরয়েড ইত্যাদি। এই বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি গ্রহণ করে আমরা অনেকে রোগীকে বুঝিয়ে ইনহেলার, রোটাক্যাপ ব্যবহার করাই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমি অকারণে অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েড ব্যবহার করি না।

অন্যান্য কিছু গ্রাম্য চিকিৎসকের (অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ) সম্বন্ধে যতটুকু জানি: আগেই বলেছি, আমরা যারা সংগঠনে থেকে অনেকদিন ধরে নানান বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়েছি, তাদের অনেকের রোগনির্ণয় এবং সঠিক ওষুধ প্রয়োগ, শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে

(অ্যানাটমি ইত্যাদি) বেশ খানিকটা জ্ঞানার্জন হয়েছে। কিন্তু একটা বিরাট অংশের পল্লী চিকিৎসকদের সেই শিক্ষা নেই। ফলে তাঁরা ধোঁয়াশার মধ্যে থেকে ভুলভাল চিকিৎসা করেন। সাধারণ অ্যানাটমি ইত্যাদি জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে। কোন্ ক্ষেত্রে কোন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হবে, কোন ধরনের পেটব্যথায় বা শারীরিক অন্যান্য ব্যথায় প্রদাহনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে, সে সম্বন্ধে ধারণা নেই। ফলে প্রকৃত রোগ ও রোগী সেখানে জটিলতার মধ্যে পড়ে। এদের বেশিরভাগই প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞানে ভরা তাঁদের মন, মানসিকতা। আমার ধারণা নিজে বিজ্ঞানমনস্ক না হলে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ইত্যাদির পরিষেবা তাঁরা কীভাবে দেবেন? এঁদের যদি চিকিৎসা জগতের মধ্যে রাখতে হয়, তবে একদম গোড়া থেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তবেই চিকিৎসা করার ছাড়পত্র দিতে হবে।

এছাড়া অনেক হোমিওপ্যাথ বা আয়ুর্বেদ ডাক্তার আছেন, যাঁরা ওষুধের নামে অ্যালোপ্যাথ ওষুধ (স্টেরয়েড, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি) গুঁড়ো করে পুরিয়া তৈরি করে, জলে গুলে ব্যবহার করছেন। তাতে রোগী আপাতভাবে দ্রুত উপশম পাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে প্রবল চমক, নামডাক হচ্ছে কবিরাজের, হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের। মুখে মুখে রটে যাচ্ছে সেইসব ডাক্তারের 'ধন্বন্তরিতা'। এই পরিস্থিতির লাগাম না টানলে অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষ ভীষণ সংকটের মধ্যে পড়বে। সমগ্র চিকিৎসা জগতে এক ভয়ঙ্কর আলোড়ন পড়ে যাবে। এইসব ডাক্তারবাবুদের কয়েকজনকে আমি চিনি। এছাড়াও এই এলাকায় মুদির দোকানে কিছু কিছু ওষুধ রাখার প্রচলন রয়ে গেছে। তাছাড়া তেল-জলপড়া, মন্ত্র-মাদুলি-কবচ ইত্যাদি বেশ ভালই চালু রয়েছে। বহু মাতাজি-বাবাজি-গুরু-গুনিন রয়েছে, যারা সাধারণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগে চিকিৎসার নামে ভয়ঙ্কর বুজরুকির 'শিল্প কারখানা' গড়ে তুলেছে। প্রশাসন নীরব দর্শক। স্বাস্থ্যবিভাগ নির্বিকার। মোটকথা, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে অহরহ।

তবে এখন সাপে কামড়ালে, কুকুর কামড়ালে ওঝা বা থালাপড়া ইত্যাদির কবল মুক্ত হয়েছে আমাদের এই মহকুমা অঞ্চল। প্রত্যন্ত স্থানে এই বুজরুকি ব্যাপকভাবেই চালু আছে কি না জানি না। সামগ্রিক বিচারে প্রভাব খানিকটা কমলেও একেবারে মুক্ত হয় নি। আর একটা বিষয় হল, ডেলিভারি পেশেন্ট এখন হাসপাতাল, নার্সিংহোমেই যাচ্ছে।

হোমিও-প্রীতির কিছু রোগী: এই ধরনের অনেক রোগী (উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা) হোমিও করে সুফল না পেয়ে শেষে অ্যালোপ্যাথের শরণাপন্ন হন। আবার কেউ কেউ একই সঙ্গে দুটি-তিনটির ব্যবহারও চালিয়ে যান (হোমিও, কবিরাজি, মাদুলি)। তাঁদের মত, অ্যালোপ্যাথে সাইড এফেক্ট হয়। আমি বলি, যে ওষুধের ক্রিয়া আছে (রোগ সারাতে সক্ষম) তার খানিকটা প্রতিক্রিয়া থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সঠিক মাত্রায় বিজ্ঞানভিত্তিক ওষুধ প্রয়োগে যতটুকু ক্ষতি, তার চেয়ে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যায়। যেমন মৃত্যুর কিংবা জটিলতার ঝুঁকি কমে যায়। আমার উপলব্ধি একমাত্র অ্যালোপ্যাথি ওষুধ, মানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওষুধই মানুষকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

বিবর্তনে রোগ-রোগী, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি : শুরুর সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে রোগ ইত্যাদির বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন নতুন কিছু শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে ভোগ বিলাসিতা। গ্রামের মানুষও এখন অনেকে বিশেষ কায়িক পরিশ্রম করে না। ফলে ডায়াবেটিস, স্থূলতা, গাউট, হার্টের সমস্যা প্রায় এপিডেমিক আকার নিচ্ছে।

বয়র ৬/৭ আগেও সিজনাল কিছু রোগব্যাধি লক্ষ্য করা যেত। শীত-গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণে সর্দি, কাশি, গলাব্যথা। বর্ষার সময় আমাশয়, ডায়ারিয়া, দাদ-হাজা-চুলকানি হত। এখনও এইসব রোগ হয়, তবে সারা বছরই। প্রচুর শ্বাসকষ্টের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এর কারণ পরিবেশের দূষণের ফল। দূষণের প্রধান কারণ বৃক্ষনিধন। গ্রামের দিকে বড় বড় আমা-জাম-কাঁঠালের বাগান আর নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনভূমি ধ্বংস করে, চাষযোগ্য জমিতে বসতবাড়ি গড়ে উঠছে।

কিছু অসুস্থতাকে আমি ম্যান-মেড বলি। অর্থাৎ সাধারণের অজ্ঞানতা, অসচেতনতার ফলে বাড়ছে সে সব রোগ, যেমন গ্যাস-অম্বল-বদহজম, মেদবৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়, হাটেবাজারে, মাঠেঘাটে এখন প্রচুর ফাস্টফুডের দোকান তৈরি হয়েছে। সকাল-বিকেল সে সব কারখানা চালু হয়ে যায়। মানুষ লাইন দিয়ে বিচিত্র সব তেলেভাজা, চাউমিন, মোগলাই, ফুচকা, চিপস ইত্যাদি অতি তৈলাক্ত, অতি লবণযুক্ত ফাস্টফুড কিনে খাচ্ছে। অনিবার্যভাবে অবাঞ্ছিত শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এখন প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটেছে। বিদ্যুৎশক্তির হাত ধরে ঢুকেছে টিভি। সন্ধ্যা হলে ছেলে-বুড়ো সকলে সিরিয়ালে অভ্যস্ত। দেখতে দেখতে মুখ চলে টুকটাকে। রাত ১০টা-১১টা-১২টায় প্রচুর নৈশভোজ সেরে ধপ করে বিছানায়। অনিবার্যভাবে উক্ত

রোগসমূহ হচ্ছে। তাছাড়া প্রায় ঘরে ঘরে মোটরচালিত যান হয়েছে, কেউ আর প্রায় হাঁটছেই না। প্রচুর ডিজেল পেট্রোলচালিত গাড়ি চলার ফলে ভীষণভাবে বায়ুদূষণ ঘটছে; ফলে ফুসফুস সংক্রান্ত রোগের সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

রোগীর ওষুধ গ্রহণ: শিক্ষিত অশিক্ষিত যাঁদের উচ্চরক্তচাপের, ডায়াবেটিসের, শ্বাসকষ্টের ওষুধ নিয়মিত খেতে হয়, তাঁদের বারবার নিয়মিত ওষুধ গ্রহণের পরামর্শ দিলেও তা পালন করেন না। বলেন, প্রেশার কম আছে তাই বন্ধ করেছেন। এই সমস্ত রোগের ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার না করলে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়। হার্ট অ্যাটাক হবার সম্ভাবনা প্রবল। অনেক রোগী প্রয়োজনীয় কোর্স করেন না। অনেকে দু-এক ডোজ ওষুধ নিজেরাই চেয়ে নেয়। এই সমস্ত নানান সমস্যার মধ্যে গ্রামে ডাক্তারি করতে হয়।

এক রোগী নিয়ে সমস্যা: বছর দুই আগের কথা। প্রবল জ্বর, মাথাব্যথা, কাঁপুনি, বমি এসব লক্ষণের এক রোগীর বাড়ি থেকে গভীর রাতে কল পেলাম। রোগী মুম্বইয়ে কাজ করত। রোগীর ম্যালেরিয়া ধরে নিয়ে অ্যান্টি ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিয়েছিলাম। ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পর বমি করে সমস্ত ওষুধ উগরে দিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করতে বলা সত্ত্বেও সকাল ১০টাতেও বাড়ির লোক এই পরামর্শের উদ্যোগ নেন নি। আমার উদ্দেশে খিস্তি, প্রাণনাশের হুমকি চলতে থাকল ফোন মারফত। ডাক্তারখানা বন্ধ করে সংগঠনের প্রধানকে বিস্তারিত জানালাম। সেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর যে ডাক্তারবাবুর আন্ডারে ভর্তি করা হয়েছিল, সেই ডাক্তারবাবুকে সব কিছু বলার পর তিনি রোগীর বাড়ির লোককে বুঝিয়েছিলেন, যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে, তার জন্য এইসব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আসলে ঐ রোগীর মস্তিষ্কজনিত (মেনেনজাইটিস) সমস্যা ছিল, যা আমার কাছে প্রকাশ করেন নি। পরে সেই রোগীকে আর জি কর-এ ভর্তি করা হয়েছিল। সুস্থও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রোগীর বাড়ির লোকজন আইনি পথে যান নি। এই ঘটনার পর ঐ পরিবার আমার কাছে আর চিকিৎসা করান না।

পরিশিষ্ট : সব শেষে বলি, যেসব কোয়াকরা আছেন (যাঁদের অনেকের জ্ঞান খুব সীমিত) সেই সমস্ত ডাক্তারদের চিহ্নিত করে মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্নদের অবিলম্বে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তবেই এই পেশায় স্বীকৃতি দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। যাঁরা চাতুরি করেন, বুজরুকি করেন তাঁদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যদপ্তরের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যিক। না হলে শেষের সে দিন বড় ভয়ঙ্কররূপে করাল দাঁত বসাবে। **উ মা**

পুস্তক পর্যালোচনা

বাঙালি মেয়ের চাকরি-জগৎ

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

চাকুরিজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা, উনিশ থেকে বিশ শতক। সোহিনী সিন্‌হা। অরুণা প্রকাশন কলকাতা-৯
মূল্য - ২৫০.০০

চাকুরিজীবী বাঙালিনী। বর্তমানে যদিও কিছু চোখে পড়ে (শতাংশের হিসাবে বেশ কম), উনিশ থেকে বিশ শতকে তার পরিমাণ আরও কম ছিল। তথাকথিত বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে কীভাবে এই চাকরির প্রয়োজনীয়তা মহিলাদের মধ্যে আস্তে আস্তে দেখা দিল এবং সেই সূত্র ধরে তাঁরা কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক বিধিনিষেধ ভেঙে, বিভিন্ন তির্যক সমালোচনা পার হয়ে চাকরির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তার একটা বর্ণনা আমরা এই লেখাতে পাই। উনিশ শতকে 'নিম্নবিত্ত' মহিলারা কতরকম বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন তার একটা সাবলীল বর্ণনা লেখিকা দিয়েছেন। যেমন জনৈকা 'রাজুর মা' নাপিতানি অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন বা কেউ কেউ বাড়িতে বাড়িতে গল্প করতে আসতেন এবং তার জন্য তাঁরা পারিশ্রমিক নিতেন।

মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মহিলাদের চাকরিক্ষেত্রে আসার প্রবণতা তৈরি হয় চল্লিশের দশকে। বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তঃপুরের মহিলারা বাইরের জগতে আসতে শুরু করেন। বিশেষ সারণির মাধ্যমে লেখিকা কর্মরতা মহিলার সংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়েছেন। চারটে অধ্যায়, উপসংহার এবং গ্রন্থতালিকা নিয়ে ১৪৪ পাতার এই বইটি সুখপাঠ্য।

পরিশেষে, কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করি। অধ্যায়গুলির নাম থাকলে পাঠকের বোঝার সুবিধে হয়। বানান ভুল কিছু আছে। সেগুলো ঠিক করা দরকার। কিছু সারণিতে সময়ের উল্লেখ নেই (সারণি ১, সারণি ২)। এইরকম প্রথম অধ্যায়ে ঐতিহাসিকের নাম আরেকটু কম হলে আরো সুখপাঠ্য হত।

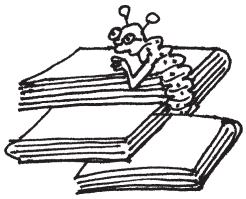

রামায়ণে ভূগোলকে নতুন ভাবে চেনা

ধ্রুবা দাশগুপ্ত

রামায়ণ- প্রকৃতি, পর্যাবরণ ও সমাজ।
ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স।
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪।
মূল্য - ৩০০ টাকা।

ছেলেবেলায় দিদা আমায় রামায়ণ ও মহাভারত দুই-ই পড়ায় উৎসাহ দিতেন আর গল্প শোনাতেন। তবে বহু-চরিত্রের মহাকাব্য মহাভারতই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করত। একটা কথা খুব শুনতে পেতাম : 'যা নাই ভারতে, তাই আছে মহাভারতে'। কিন্তু আজ যখন ফিরে দেখি, তখন বুঝি যে, যাঁরা এই কথাটি চালু করেছিলেন, তাঁরা মহাভারতের চরিত্রের বৈচিত্র্যময়তার কথা বেশি করে তুলে ধরেছেন। মানুষ ও প্রকৃতির আদানপ্রদানের যে বৈচিত্র্যময়তা আছে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করেন নি। 'রামায়ণ- প্রকৃতি, পর্যাবরণ ও সমাজ'-এর গ্রন্থকার ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঠিক এই কাজটিই করেছেন দশ-এগারো বছর ধরে, অনেক ভালবেসে। তাঁর এই নিষ্ঠার ফলস্বরূপ আমরা এই উপরোক্ত গ্রন্থটি পাই যা রামায়ণকে একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে শেখায়। এই দেখতে শেখানোর ফলে একজন উৎসুক পাঠক হিসেবে আমার যা চোখে পড়েছে, তাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আমাদের দেশে, বিশেষত উত্তরভারতে রাম যেভাবে চিত্রায়িত, তাতে অনেকে ভুলেই যান যে রামায়ণ একটি মহাকাব্য এবং রাম একজন কল্পনায়ক। রামায়ণের সময়রেখা প্রমাণিত নয়। তথাপি রামকে সুদূর ইতিহাসের এক সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্র বলে মনে করেন বহু সাধারণ ভারতবাসী। রামের চরিত্রের সঙ্গে অনেক আবেগ জড়িত আছে। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের কাছে রামায়ণকে এক সামাজিক দলিল হিসেবে পৌঁছে দিয়ে রামায়ণ নিয়ে অন্যভাবে ভাবতে শেখানোর বিরল প্রচেষ্টার ফল এই গ্রন্থটি। ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য অনেক বিষয় এতে বিশ্লেষণ করা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি হতে পারে রামায়ণে বর্ণিত আদিবাসী সমাজের রীতিসমূহ, রামায়ণের যুগে নারীদের সামাজিক অবস্থান, তৎকালীন সময়ে আদিবাসীদের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে আর্য-সমাজের কাঠামোর তুলনা, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে তৎকালীন সমাজে সচেতনতা, সমাজে বা syncretism ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক আদানপ্রদান। আরও ভেবে দেখলে তালিকাটি দীর্ঘায়িত হবে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে যে গ্রন্থকার রামায়ণ মহাকাব্যকে ধর্মীয় মাত্রাযুক্ত না করে এই রচনাটিকে একটি সুসংগঠিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ গড়ে তোলার উপাদান হিসাবে দেখেছেন এবং বাল্মীকির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। পাঠক গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হন বা না হন, বাল্মীকির ইঙ্গিতময় কাব্যগ্রন্থের সমাজতত্ত্ব নিঃসন্দেহে পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

কী কী আছে এই রামায়ণের সমাজে? আছে পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় একটি সঙ্কটাপন্ন সমাজ, যার ছবি তুলে ধরে কবি বাল্মীকি একজন আদর্শ রাজার খোঁজ করছেন, যাঁর সুশাসনে সমাজে শৃঙ্খলা এবং ন্যায়পরায়ণতা আসবে। কবি তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ জুড়ে তাঁর কল্পচরিত্রের বিন্যাসে এমনভাবে এগিয়ে গিয়েছেন যাতে তিনি অহঙ্কারী আর্য-সমাজের পরিবর্তে এই ভূখণ্ডের মূলনিবাসীদের সুসংগঠিত এবং বহুগুণসম্পন্ন সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার কথা কল্পনা করেছেন। উপরন্তু আদিবাসী সমাজের গুণগুলিকে আর্যরা নিজের সমাজে বরণ করে নিলে যে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ হবে, সে কথাও ইঙ্গিত করেছেন বাল্মীকি। যেমন বালীর ছোট ভাই সুগ্রীবকে অরণ্য এবং সেখানের ভৌগোলিক চরিত্র বিশ্লেষণে সুপণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুগ্রীব যখন সীতার অন্বেষণে বিভিন্ন দিকে বানর সেনার দল পাঠালেন উনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যেকটি দলকে বর্ণনা দিয়ে দিলেন যে তারা কী কী পেতে পারেন। সেখানে সুহৃদ রাম তাঁর বন্ধুর ভৌগোলিক জ্ঞান নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ

করছেন এবং শিখছেন। বৃক্ষ কীভাবে মানুষকে আগলায় তার বিশদে সুগ্রীব বলছেন :

''সর্বর্তুসুখসেব্যানি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।

মহার্হমণিচিত্রাণি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।'' কাণ্ড : কিষ্কিন্ধা, সর্গ: ৪৩, শ্লোক:৪৬

কোনও কোনও গাছ সব ঋতুতে এমন ফলদান করে, যা নিজের সুখে মানুষ খেতে পারে, আবার কোনও গাছ বহুমূল্য মণিসদৃশ ফল ধারণ করে। প্রকৃতি এবং মানুষের সম্পর্ক নিয়ে যে গভীরতর আলোচনা গ্রন্থকার করেছেন, তা নিয়ে পরে আলোচনা হবে। বর্তমানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আদিবাসী/মূলনিবাসীদের অরণ্য সম্পর্কে জ্ঞান লক্ষণীয়, এইটাই আর্যদের শেখা উচিত, এমন প্রভূত উল্লেখ রামায়ণে আছে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রামায়ণ মহাকাব্যটি বহু ভাষায় চর্চিত। A Critical Inventory of Ramayana Studies in the World - Voume II (Foreign Languages) বইটিতে আমরা জানতে পারি, রামায়ণ মালয়, সিংহলী, ফিলিপিন্স, আরবি, ফারসি, উর্দু, নেপালী, ব্রহ্মদেশীয়, ব্রাজিলীয়, বুলগেরীয়, চেক, খমের, মিশরীয়, হাঙ্গেরীয়, হিব্রু, ইতালীয়, লাতিন, তুর্কী, রুশ, উজবেক, চীনা, জাপানী প্রভৃতি ৩২টি ভাষায় চর্চিত হয়েছে। মহাকাব্য হিসেবে তার বিশ্বজোড়া কদর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষামূলক গ্রন্থ হিসেবে, সামাজিক নীতিশিক্ষার উদাহরণ হিসেবে বিশেষভাবে গৃহীত। তথাপি সুপণ্ডিত, সদ্য-প্রয়াত সিংহলী কূটনীতিবিদ এবং শিক্ষক প্রফেসর আনন্দ গুরুগে তাঁর ১৯৯১ সালে লেখা The Society of the Ramayana বইটিতে বলেছেন ''...despite the fact that a number of books and articles exist on the linguistic, textual and literary aspects of the epic its sociological data have not been sufficiently treated. Also, there is more extensive dealing with the spiritual and moral bias of the Ramayana.'' প্রফেসর গুরুগে রামায়ণে বর্ণিত প্রাচীন ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে পিএইচডি করেছিলেন। প্রফেসর গুরুগের কাজের পরেও একটি অপূর্ণতা থেকেই গিয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার বছরদশেক আগে আমরা পেয়েছিলাম ডঃ মন্দাক্রান্ত বসুর সম্পাদনায় ১৪টি রচনা সমৃদ্ধ বই The Ramayana Revisited (২০০৪ সাল- Oxford University Press)। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের লেখার পূর্বে এই মতকে খুব সম্ভবত এইটাই রামায়ণের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা। তবে সেটা বাল্মীকির মূল গ্রন্থের উপর জোর না দিয়ে এই গ্রন্থের ভৌগোলিক প্রভাবের উপর জোর দিয়েছে। তাই বর্তমান গ্রন্থটির তাৎপর্য বাল্মীকির গ্রন্থে ভূগোলকে নতুন করে চিনতে শেখানো। অনেক কিছুই বলা যায়, তবে জায়গার অভাবে অত বলতে পারব না। শুধু বেছে নিলাম সীতা অনুসন্ধান ভূগোল। কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের ভূখণ্ডে প্রেরিত বানরবাহিনী যে যে পথ দিয়ে গিয়েছে, সেই পথগুলির সম্পর্কে বাল্মীকির বিশদের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন গ্রন্থকাব।নদী বর্ণনা, অরণ্য বর্ণনা এবং প্রজাতি (বণ্য প্রাণী ও মনুষ্য প্রজাতি বর্ণনার মাধ্যমে। এই পথগুলি মানচিত্রায়ণের তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে। এই কাণ্ডে ১৩টি মানচিত্র গ্রন্থকার কবি বাল্মীকির রচনার সাহায্যে এঁকেছেন যেগুলি সুনিপুণভাবে তৎকালীন ভূগোলকে চিনতে সাহায্য করে। বিশেষ আকৃষ্ট করে ২৬২ পাতায় শক জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে আলোচনা যেখানে গ্রন্থকার বলছেন যে বাল্মীকি মেরুকরণ সম্পর্কে সাবধান করছেন। গ্রন্থকার বলছেন– **মেরুকরণ আছে মহাভারতেও, ব্যতিক্রম বাল্মীকি। আড়ে ধারে বার বার এই কবি সাবধান করেছেন বৈদিক কুলকে। বার্তা দিয়েছেন– 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ...' শক হুনদল পাঠান মুঘল এক দেহে লীন হতে বাধ্য এই ভারতবোধ বাল্মীকির সদাজাগ্রত ছিল।**

শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের এই অনুসন্ধানী গ্রন্থটির সামাজিক চিত্র রচনার একটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি কাণ্ডের শেষে উদ্ভিদ, প্রাণী, জনপদ, পর্বত, তিথি, অরণ্য ও অন্যান্য ভৌগোলিক বিষয়; জাতি, পেশা সম্পর্ক; দ্রব্যাদি, সামগ্রী, উপকরণ, বিষয়; অস্ত্রাদি, বিশিষ্ট চরিত্র বিষয়ক বিশদ আছে। এই বিশদে চোখ রাখলে তৎকালীন ভূখণ্ডের চিত্র এক ঝলকে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ১৮৮ পাতায় ১০নং টীকায় বলছেন, রামায়ণে 'ভারত' শব্দটি ব্যবহৃত নেই। তথাপি তৎকালীন ভারতের মানচিত্রায়ণ হয়েছে কিষ্কিন্ধা কাণ্ডের শেষে।

রামায়ণের সঙ্গে প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান দুই বিষয়েই সংযোগ আছে। এই দিকটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরা গ্রন্থকারের অন্যতম সফল প্রচেষ্টা। প্রথমেই বিজ্ঞানের কথায় আসি। গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে বাল্মীকি জটায়ুর মাধ্যমে বিবর্তনবাদের কথা বলেছেন, পাশ্চত্ত্যের তত্ত্ব বলে বিবর্তনবাদ স্বীকৃত হলেও বাল্মীকি রামায়ণে এই তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অরণ্যকাণ্ডের শেষে এর বিশদ বিবরণ। জটায়ুর ভাই সম্পাতি অঙ্গদদের সীতাহরণের বিবরণ দিতে গিয়ে আকাশপথের বিজ্ঞান শেখালেন এবং বিবর্তনবাদের ভারতীয় সমীক্ষা

জানালেন। ভারতীয় বিবর্তনবাদ পক্ষিকুলকে সব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সৃষ্টিকারী প্রজাতি বলে সমর্থন করে।

'রামায়ণ : প্রকৃতি, পর্যাবরণ ও সমাজ' বইটির প্রাণকেন্দ্র কিন্তু প্রকৃতি ও আদিবাসীদের নিয়ে, তাদের সমাজকে নিয়ে আলোচনা। কল্পনায়ক রামকে সারা ভারতের একটি বড় ভূখণ্ড পদব্রজে ভ্রমণ করিয়েছেন বাল্মীকি। আদিবাসীদের সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বৃক্ষপূজা, বৃক্ষ প্রদক্ষিণ রীতি ও বৃক্ষের কাছে আশীর্বাদ চাইবার রেওয়াজের কথা কবি সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে আবিষ্ট। প্রত্যেকটি কাণ্ডের শেষে বর্ণিত উদ্ভিদের নাম, তার চলতি নাম ও লাতিন (বিজ্ঞানভিত্তিক) নামের তালিকা বাল্মীকির প্রতি শ্রদ্ধা তথা বর্তমান গ্রন্থকারের নিষ্ঠার পরিচায়ক। এই বর্ণনা শুধু জীববৈচিত্র্যের পরিচয় দেয় না। সে বৃহত্তর আদিবাসী/মূলনিবাসী চরিত্র যথা বানরবীরদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বার্তা এবং তার জন্য আদিবাসী সমাজের বন সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির কথা বিশদে উল্লেখ করে। আমরা পাই গ্রহজৈব ভাণ্ডারের কথা (Biosphere Reserve) যেখানে কারও প্রবেশ নিষেধ, রামায়ণে উল্লিখিত সপ্তজন অরণ্যে মনোরম বিবরণ আছে, তাছাড়া পাই মতঙ্গাশ্রমের এবং ঋষ্যসূতক অরণ্যের কথা: কিষ্কিন্ধার প্রান্তে, যেখানে মহাপরাক্রমী বালীও নিষেধাজ্ঞা মানতে বাধ্য, অরণ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁকে মতঙ্গ মুনির নির্দেশ মানতে বাধ্য করেছিল। অরণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে তৎকালীন অনার্য আদিবাসীদের অনেক বেশি গভীর ছিল তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে বানর যুবরাজ অঙ্গদ ভাবী রাজা হয়েও বনরক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং অরণ্য নষ্ট করার জন্য অরণ্যপালের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন (কিষ্কিন্ধা কাণ্ড)। তৎকালীন অনার্য আদিবাসীদের (বানর ও যক্ষ) জীবন ও সমাজ আচার সম্পর্কে কবি যে কতটা শ্রদ্ধাবান তা রামায়ণের শ্লোকে শ্লোকে মূর্ছিত ও বিধৃত।

এই গ্রন্থ নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা যায়, পাঠক সমৃদ্ধ হবেন। শুধু একটি চাহিদা থেকেই গেল, পৃষ্ঠা ১৯৮-২০০ জুড়ে তুলসীদাসের রামায়ণের সঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণের যে কিছু কিছু তুলনা রয়েছে সেগুলি আরো বিস্তারিত পর্যালোচনা হলে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে পাঠক আরও সমৃদ্ধ হতে পারতেন। **উমা**

কেন পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন দানা বাঁধছে না?

বিবর্তন ভট্টাচার্য

প্রায় ২৫ বছর এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে আমার ও আমাদের বন্ধুদের যে অনুভূতি তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করলাম।

চাকদহের একটি নাটকের ক্লাব 'হ-য-ব-র-ল'। এই গ্রুপ থিয়েটারে নাটক দিয়েই শুরু করেছিলাম স্কুল জীবনে। তখন যাঁরা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন করতেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। শম্ভু মিত্র, শাঁওলি মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, রুদ্রদা (রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত), অশোকদা (অশোক মুখোপাধ্যায়), আমাদের ক্লাবের নাট্যনির্দেশক প্রয়াত অমল বিশ্বাস এবং আমার মা প্রয়াত ভূমিকা ভট্টাচার্য। এই সময় গ্রুপ থিয়েটার করা মানুষগুলোর একবেলা খাওয়া জুটত কি জুটত না তাতে কিছু এসে যেত না। কোন ডায়ালগ দর্শকের কানে কেন পৌঁছল না অথবা এবার থেকে ভাল করে স্তানিস্লাভস্কি অথবা ব্রেশ্‌ট পড়তে হবে। গায়ক অজিত পাণ্ডে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমাদের বাড়িতে থাকতেন। তখন বাঁশবেড়িয়া-হাওড়া লাইনে উনি 'দেশব্রতী' কাগজ বিক্রি করতেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসও আমাদের বাড়িতে আসতেন।একদিন অজিতমামার (অজিত পাণ্ডে) সঙ্গে কি গণ্ডগোল হারমোনিয়াম নিয়ে। অজিতমামা কিউবায় গান গাইতে যাবেন। প্লেনে হারমোনিয়াম নিয়ে গেলে বেশি পয়সা লাগবে, তারপর এত ভারী! কিন্তু হেমাঙ্গদা জোর করে বললেন, 'তোকে হারমোনিয়াম লইয়া যাইতে হইব। আমাগো দ্যাশের হেরিটেজ এইটা। লইয়া গেলে তোর সম্মান বৃদ্ধি পাইব।' প্রথমে রাজি না থাকলেও পরে রাজি হলেন অজিতমামা এবং হারমোনিয়াম নিয়ে রওনা হলেন কিউবা। কিউবা থেকে ফিরে এসে বললেন, ওদেশে অরগ্যান চালু, তাই হারমোনিয়াম দেখে পাগল হয়ে গেছে ঐ দেশের মানুষ। আসলে পেটে খাবার থাকুক না থাকুক সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চায় ওদের ডেডিকেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু সে সময় আমার মনে হত শুধু নাটক আর

গান গেয়ে ব্যবস্থা পাল্টানোর যে স্বপ্ন দেখে এই গোষ্ঠী তা মনে হয় ঠিক নয়। কিন্তু তাঁদের আবেগ ও প্রত্যয় আমাকে উজ্জীবিত করত।

কিন্তু সেই সময় যাঁরা পরিবর্তনের আন্দোলন করতেন তাঁরা রাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর চিরুনি তল্লাশির ফলে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। কলকাতা কলেজে পড়ার সুবাদে সুন্দরবনে গ্রাম উন্নয়নের কাজে প্রায় ১০ দিন সাতজেলিয়া থাকতে হয়। সেই সময়ে আত্মগোপন করে থাকা কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরাই আমার চিন্তার পরিবর্তনের মূল কারিগর। একটা কথা আজও মনে আছে, 'তুমি যদি প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক হও ও ধারাবাহিকভাবে ছোট ছোট করে কাজ করে চলো, সেই কাজটাই হবে ব্যবস্থা পরিবর্তনের কাজ। এর সাথে বিজ্ঞান ক্লাবের কী যোগ? গোবরডাঙাতে তো একটা বিজ্ঞান ক্লাব আছে! ওরা একটা রেডিও স্টেশন বানিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে কঠিন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচার করে।' আমি মাঝে মাঝে শুনি, কিন্তু সব বুঝতে পারি না। তখন সেই অগ্রণী বিজ্ঞানকর্মীগণ যা বলেছিলেন, তা তুলে ধরলাম।

একদল পণ্ডিত মনে করেন, বিজ্ঞান আন্দোলন মানে বিজ্ঞান সম্পর্কিত পদ্ধতি নিয়ে মানুষকে অবহিত করা। এই পদ্ধতি অনুসারে কোয়ার্ক কিংবা নিউক্লিক অ্যাসিড অথবা লেসার বা প্রিয়ন অথবা ভিরিয়ড নিয়ে আলোচনা হল বিজ্ঞান আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে মানী পণ্ডিতবর্গকে বিজ্ঞানের আঙিনায় পাওয়া যাবে। বেশ একটা এলিট বিজ্ঞানচর্চাও চলবে। বিজ্ঞান আন্দোলন বলতে একদল বোঝেন, সরকার যা প্রচার করছে তা পুনঃপ্রচার করা। যেমন সৌরশক্তি ব্যবহার, শৌচাগার নির্মাণ, এইডস বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা, রাস্তার কাটাফল খাওয়া থেকে বিরত থাকা, সরকারি প্রচারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া-- এইগুলো হল বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ।

বিজ্ঞানচেতনা বা বিজ্ঞানমনস্কতার বিষয়ে প্রশ্ন এঁরা সযত্নে এড়িয়ে চলেন। কুসংস্কার ও জ্যোতিষ বিরোধিতা ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সরকারকে তা আঘাত না করে। যাঁরা এই কাজ করেন, তাঁদেরকে ঐ বিজ্ঞানকর্মীগণ হঠকারী বলে মনে করেন। আর একদল বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী আছেন, যাঁরা সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী, গুণে নয় পরিমাণে বিশ্বাসী। এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। তাই বিরোধিতা সংখ্যাগত নয়, বিরোধিতা গুণগত প্রশ্নে। বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার প্রশ্নে মানুষকে সামিল করতে গিয়ে আসল লক্ষ্যটা হারিয়ে গিয়ে সংখ্যাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়, তবে বিরাট ভুল হবে।

এইসব সুন্দর ও অসম্ভব ভাল কথা বলা মানুষদের যখন দেখি কেউ কোনো পুরসভার চেয়ারম্যান, কেউবা সরকারি অনুগ্রহ নেবার জন্য নিজের বিজ্ঞান ক্লাবকে শাসকদলের কাছে সমর্পণ করছেন, তখন একটু কষ্ট পাই।

আসল প্রশ্ন হল, পরিশীলিত জীবনযাপন। বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বড় সঙ্কট হল মর্যাদাবোধ যা শাসককুল আপামর মানুষের থেকে লুট করতে সক্ষম হয়েছে, দর্শন আর মূল্যবোধটাকে গুলিয়ে দিয়েছে কিছু বুদ্ধিবিক্রেতা। তাই রাজনৈতিক সংগঠন থেকে ক্লাব সংগঠন চালাতে গেলে টোল দিতে হবে। অল্প একটু মূল্যবোধ ও মর্যাদাবোধ থাকলে তুমি বোকা লোক। প্রশ্নটা তাই, এই বোকা লোকদের দলে আমরা থাকব কি থাকব না? এইসব করে জনপ্রিয় হয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে যোগদান করব কি? খুব ভাল করে ভাবনার সময় এসেছে। সরল মনে গ্রামের বিজ্ঞান সংগঠন যে হাতটি ধরছে তার কিছুদিন পরে তারা বুঝতে পেরেছে ঐ হাতটি কৃত্রিম। সে যুক্তিবাবাই হোক অথবা অতি প্রগতিশীল জালিয়াতটি।

প্রথম থেকেই আমরা শিখেছিলাম, বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উত্তরিত কর্মীগণ ব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলনে যোগদান করবেন। কিন্তু পিছিয়ে থাকা কিছু বিজ্ঞানকর্মী ছাড়া খুব একটা কাউকে দেখতে পাই নি।

আমার মনে হয়েছে, আমরা যারা বিজ্ঞানকর্মী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্তরিক, তাদের মধ্যে এত কূটকচালি থাকবে কেন? আমরা তো সবাই একই উদ্দেশে কাজ করছি। তবে কেন এই নিন্দামন্দ করা! আমরা সবাই যদি এই বিদ্বেষহীন সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ হই, তবে এই স্বপ্নকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। চলতে থাকুক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু শাসকের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে বিপদে পড়া বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোর সঙ্কল্প নিন। তবেই শক্তিশালী হবে গণবিজ্ঞান।

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষে

উমা